বাস্তেন দ্বীপে অভিযান

অজেয় রায়

বাস্তেন দ্বীপে অভিযান

সুনন্দ হঠাৎ খপ করে আমার হাতটা চেপে ধরে বলল, দাঁড়া। সামনে একটা ছিনতাই কেল মনে হচ্ছে। দেখি ব্যাপারটা? দুজনে স্তব্ধ হয়ে যাই। একটু সরে গেলাম পাশে গাছের ছায়ার আড়ালে। চুপচাপ দেখতে থাকি।

কলকাতা শহর। রাত দশটা বাজে প্রায়। আমি আর বন্ধু সুনন্দ গিয়েছিলাম গঙ্গার ধারে বেড়াতে বেড়াতে এবং আড্ডা মারতে। ওখানে আরও কয়েকজন বন্ধু প্রায়ই জমা হই সন্ধে থেকে।

হেঁটে ফিরছিলাম রাজভবনের গা ঘেঁষে। এসপ্ল্যানেড় অবধি হেঁটে গিয়ে বাস ধরব। ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ। গরম কমেছে কলকাতায়। তবে শীত পড়েনি তেমন। ভালোই লাগছিল হাঁটতে। ফুটপাতে তখন পথচারীর সংখ্যা বেশ কম। রাস্তায় গাড়ি ছুটছে। হু হু করে মাঝে মাঝে। রাজভবনের পাঁচিলের ধারে ধারে গাছগুলোর লম্বা লম্বা ছায়া পড়েছে ফুটপাতে। এক ফালি চাঁদ আবছা আলো ছড়াচ্ছে আকাশে। স্ট্রিট লাইটগুলো অবশ্য জ্বলছে। আলো-আঁধারি মিশেল বেশ রহস্যময় পরিবেশ।

আমাদের আগে ষাট-সত্তর ফুট দূরে একটি লোকও এগোচ্ছিল ওই ফুটপাত ধরে। গঙ্গার কাছ থেকেই সে আমাদের সামনে সামনে যাচ্ছিল। বেঁটেখাটো প্যান্টসার্ট পরা মানুষটি ধীরে সুস্থে হাঁটছিল আমাদের মতোই। দেখলাম, হঠাৎ যেন অন্ধকার যুঁড়ে দুটো লোক সামনে খাটো লোকটির পথ আগলে দাঁড়াল। মনে হয় পাচিলের ধারে লোক দুটো গাছের ছায়ায় মিশে ঘাপটি মেরে ছিল শিকারের আশায়।

দুটো লোকের একজন বেঁটে মানুষটিকে মুঠো পাকিয়ে নিচু স্বরে বলছে কিছু। তার ভাবভঙ্গি সুবিধের নয়। দ্বিতীয় জন পাশের দিকে সরে গেল। দেখলাম যে পথ আগলানো আগন্তুক বেঁটে মানুষটির প্যান্টের পকেটে স্রেফ হাত ঢুকিয়ে দিল। হয়তো মানিব্যাগের আশায়।

পথচারী বেঁটে মানুষটি এতক্ষণ কিছু বলছিল মৃদুস্বরে আর কেবলই ঘাড় নাড়ছিল। এবার সে তড়িৎগতিতে হাত চালাল। সঙ্গে সঙ্গে তার সামনের লোকটি উলটে পড়ল ফুটপাতে। কিন্তু পাশে থাকা দ্বিতীয়জন কিছু দিয়ে মাথায় আঘাত করল বেঁটে পথচারীটিকে। লোকটি বসে পড়ে মাথা চেপে। ভূপতিত ছিনতাইকারী এই সুযোগে উঠে দাঁড়িয়েছে।

সুনন্দ বলল, ছোট। আটকাতে হবে।

সুনন্দ দৌড়ল। পিছু পিছু আমি।

যে লোকটা মেরেছিল সে ঝুঁকে তার শিকারের পকেট হাতড়াচ্ছে। দ্বিতীয় ছিনতাইকারীও কাছে এসে দেখছে। আমাদের পায়ের শব্দে লোক দুটো ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে না দেখতেই সুনন্দ ঝুঁকে পড়ার পশ্চাদদেশে কষাল ভারী জুতোর প্রচণ্ড এক লাথি। লোকটা ছিটকে উলটে পড়ল ফুটপাতে। আমি দ্বিতীয় ছিনতাইকারীর মুখে মারলাম এক মোক্ষম ঘুষি। আক শব্দ করে সে মুখ চেপে টলমলিয়ে পিছিয়ে গেল।

সুনন্দর লাথি খাওয়া লোকটা কিঞ্চিৎ সামলে উঠে দাঁড়াচ্ছে, দেখি তার হাতে একখানা ছুরি। চকচক করে ওঠে স্ট্রিট লাইটের আলোয় ছুরির সরু লম্বা ফলা। কিন্তু সুনন্দ তাকে আক্রমণের সুযোগই দেয় না। ফের এক লাথি কষায় লোকটার ছুরি ধরা হাতে কনইয়ের কাছে। ছুরি খসে পড়ে হাত থেকে। ব্যথায় কাতরে ওঠে লোকটা। তারপর ঘুরে মারল। টেনে দৌড়। তার ছিনতাইয়ের সাধ উবে গেছে। দ্বিতীয় লোকটাও প্রাণপণে অনুসরণ করল সঙ্গীকে। দুজনে রাস্তা পেরিয়ে মিলিয়ে গেল ময়দানের অন্ধকারে।

সুনন্দ ছুরিটা কুড়িয়ে নেয়। ফলাটা আট ইঞ্চি হবে। দারুণ ধার। ইস, লাভের বদলে ব্যাটাদের লোকসানই হয়ে গেল। আমরা এবার সেই বেঁটে মানুষটির দিকে নজর দিই।

লোকটি তখনো ফুটপাতে বসে। হতভম্ভ দৃষ্টি। এক হাতে চেপে আছে নিজের মাথার এক পাশ। লোকটিকে তুলে ল্যাম্প পোস্টের আলোয় পরীক্ষা করি। নাঃ রক্ত গড়াচ্ছে না। তবে লেগেছে খুব। ওর যন্ত্রণাকাতর মুখ দেখেই মালুম হচ্ছে। লোকটির মাথায় পরা কাউন্টি-ক্যাপ জাতীয় মোটা কাপড়ের টুপি তার মাথাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে এযাত্রা।

পথচারীকে দেখে আমরা অবাক। লোকটি বাঙালি নয়। মনে হল ভারতীয়ই নয়। মঙ্গোলীয় ধাঁচের মুখ। চিনা, বর্মী বা মালয়িদের মতন দেখতে। গড়ন ছোটখাটো হলেও মজবুত। লোকটি খানিক সামলিয়ে বলল, থাঙ্কু মিস্তার। ইউ ছেভ মি। ওঃ। সে নিজের মাথায় হাত বোলায় টুপিটা খুলে।

আমরা দেখলাম, কাটেনি বটে কিন্তু মাথার এক জায়গায় বেশ ফুলে উঠেছে।

কয়েকজন পথচারী ইতিমধ্যে জুটে গেছে চারপাশে। প্রশ্ন হয়–

–কী হয়েছে দাদা?

–কেসটা কী?

–ছিনতাই করছিল। জবাব দেয় সুনন্দ।

–নিয়েছে কিছু?

–মেরেছে বুঝি? লোকটা তো মনে হচ্ছে চিনেম্যান।

–হুঁ বিদেশি। তাই মনে হচ্ছে। জানাই আমি।–তবে নিতে পারেনি কিছু। আমরা কয়েক ঘা লাগাতেই পালাল লোক দুটো। আমরা একটু দূরে পিছনে ছিলাম ভাগ্যিস। তবে মেরেছে মাথায়। দেখি জিজ্ঞেস করে কোথায় যাবে? পরিচয় কী? কিছু একটা ব্যবসা তো। করতে হবে।

-হ্যাঁ হ্যাঁ তা তো বটেই। থানায় নিয়ে যান। ডায়ারি করে দিন। পুলিশই যা করবার করবে।

–সঙ্গে টাকাকড়ি বেশ আছে বোধহয়। তাই ফলো করছিল। এই লোকগুলোও সুবিধের হয় না। থানায় জমা করে দিন।

অন্য পথচারী কেউ কিন্তু ওই লোকটিকে থানায় নিয়ে যেতে সাহায্য করতে এগোল না। তারা সুটসাট কেটে পড়ল উপদেশ ঝেড়ে। ফের আমরা তিনজন। চারপাশ মোটামুটি ফাঁকা।

আক্রান্ত লোকটি এতক্ষণ চুপচাপ অন্যদের কথা শুনছিল। বোধহয় বুঝতে পারছিল। বাকিরা চলে যেতে সে মাথা নেড়ে বলল, নো পুলিশ। নো পুলিশ।

কে জানে, পুলিশে ছুঁলে আঠারো-ঘা আপ্তবাক্যটি এর জানা আছে হয়তো। যাহোক সুনন্দ তাকে ইংরেজিতে আশ্বাস দেয়, ঠিক আছে, পুলিশে রিপোর্ট করা দরকার নেই। তবে তোমার মাথায় লেগেছে রেশ। ফাস্ট-এড দেওয়া উচিত। হাঁটতে পারবে খানিকটা?

লোকটি মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

ধীরে ধীরে হেঁটে এসপ্ল্যানেডের দিকে যেতে যেতে আমরা লোকটির পরিচয় জানার চেষ্টা করি। ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করি, তুমি কয়রা কী? মানে প্রফেশন?

উত্তর হয়, সেলার।

জাহাজের নাবিক! বাঃ।

–দেশ কোথায়? ইন্ডিয়ান?

–নো। ইন্দোনেশিয়ান।

আমি ও সুনন্দ চোখাচোখি করি। দারুণ ইন্টারেস্টিং লোক। সুনন্দ আমায় ফিসফিসিয়ে বলে বাংলায়, লোকটাকে সহজে ছাড়ছি না। ওর গল্প শুনতে হবে।

বটেই তো। আমারও তাই হচ্ছে। সাত-সমুদ্রে ঘোরা জাহাজের নাবিকদের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার হয় বিচিত্র। আমরা ডাঙার মানুষরা তার কতটুকু জানি বা দেখেছি। সব বিদ্যে বই পড়ে ঠিক জানা যায় না। এসব মানুষ তাদের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা লেখেও কদাচিৎ। তবে আগ্রহ দেখালে বলে শুনেছি।

লোকটি দেখলাম ইংরেজিটা মোটামুটি বলতে ও বুঝতে পারে। কিছু বাংলা হিন্দিও জানে। তবে তেমন সড়গড় নয় কথায়, বোঝে বেশ। আরও নিশ্চয় অনেক ভাষাই কিছুটা জানে। যারা বন্দরে বন্দরে ঘোরে, তারা নানান দেশের ভাষা কাজ চালানোর মতো শিখে ফ্যালে। ইংরেজিতে চিনাদের মতো ট উচ্চারণটা করে ত এবং কিঞ্চিৎ আধো আধো সরে উচ্চারণ। জানলাম যে লোকটির নাম মিকি। মিকি হরতানো। থাকে ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রায়। বছর কুড়ি জাহাজে কাজ করছে। ওদের গ্রামের অনেকেই জাহাজি নাবিক। মিকি ধর্মে বৌদ্ধ। মিকি মালবাহী জাহাজের কাজ করে। ভারতবর্ষের নানা বন্দরে এবং কলকাতা বন্দরে কয়েকবার এসেছে আগে। ঘুরেছে কলকাতায়। কলকাতার পথঘাট চেনে কিছুটা। ওর জাহাজ খিদিরপুর ডকে ভিড়ে আছে। মাল খালাস চলছে। দিন তিনেক বাদে ফের গান করবে। ছেড়ে যাবে কলকাতা। কয়েকদিন মিকি কলকাতাতেই রয়েছে জাহাজি মাল্লাদের এক আস্তানায়। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছে আস্তানাটা। ওখানে অনেক চেনা জানা মাল্লা জোটে। আড্ডা হয়। আজ গিয়েছিল জাহাজি অফিসে একজন এদেশি লোকের সঙ্গে দেখা করতে। গল্প করতে করতে রাত হয়ে গেল। হেঁটেই ফিরছিল ওয়েলিংটনে। রাস্তা চেনে। হাঁটতে তার খুব ভালো লাগে। জাহাজে তো বন্দি জীবন। কোনো বন্দরে নামলেই তার শখ শহরটা হেঁটে দেখে বেড়ানো। আজকের মতো

উটকো ঝামেলায় আগে পড়েনি কলকাতায়। তবে অন্য দেশে পড়েছে কয়েকবার। ভাগ্যিস আজ তার পার্সটা খ– না। অনেক টাকা ছিল। আমাদের সে অনেক ধন্যবাদ জানাল এযাত্রা সেভ করার জন্য। দেশে মিকির পরিবার থাকে। স্ত্রী এবং সাত ও পাঁচ বছরের দুটি ছেলে।

কথা বলতে বলতে এসপ্ল্যানেডে হাজির হলাম। একটা দোকান থেকে বরফ নিয়ে মিকির মাথায় আঘাতের জায়গায় লাগানো হল। বরফ লাগাতে ব্যথা কিছু কমল।

এরপর সুনন্দ অনুরোধ করল মিকিকে, আজ তোমার জাহাজি আস্তানায় না গেলে। বরং চলো আমাদের বাড়িতে রাতটা কাটাবে। তোমার গল্প শুনব। কত দেশে ঘুরেছ। নিশ্চয় কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে।

মিকি ইতস্তত করছে দেখে সুনন্দ জোর দেয়, আমাদের কোনো অসুবিধে নেই। আমাদের বাড়িতে থাকি শুধু আমি আর আমার এক মামা। তিনি সায়ান্টিস্ট প্রফেসর হলেও মাই ডিয়ার মানুষ। তোমার সঙ্গে আলাপ হলে খুশি হবেন। বাড়িতে শোবার জায়গা যথেষ্ট। কী খাবে বলো রাতে। দোকান থেকে কিনে নিয়ে যাই। যা যা তোমার পছন্দ।

–অলরাইত। মিকি রাজি হয়ে যায়।

সুনন্দ বলে, বুঝলে মিকি, শহুরে লোকের সঙ্গে তো একঘেয়ে দিন কাটাই। তোমার মতো ইন্টারেস্টিং লোকের দেখা পাই খুব কম। তুমি গেলে আমাদের সৌভাগ্য। জানো আমরা খুব বেড়াতে ভালোবাসি। অনেক বেড়িয়েছি দেশে বিদেশে। দুর্গম অঞ্চলে। অচেনা দেশ, সমুদ্র, প্রাণী, গাছপালা আমাদের ভীষণ টানে। তাই তোমায় ছাড়তে ইচ্ছে করছে না।

সুনন্দ আমায় বলল, আজ রাতে তুই আমাদের বাড়িতে থাকবি। বাড়িতে ফোন করে জানিয়ে দে।

আমি তো তক্ষুনি রাজি।

এই ঘটনার ফলেই মিকির সঙ্গে সুনন্দর মামাবাবু প্রফেসর প্রাণিবিজ্ঞানী নবগোপাল ঘোষের যোগাযোগ হয়। আর তার ফলেই আমাদের এক নতুন রোমাঞ্চকর অভিযান ও অ্যাডভেঞ্চারের সূত্রপাত। এখন আমাদের নিজেদের পরিচয়টা কিছু জানিয়ে রাখি।

আমি–অসিত রায়। সুনন্দ মানে সুনন্দ বোস আমার বাল্যবন্ধু। সুনন্দর মামাবাবু শুধু প্রাণিবিজ্ঞানী নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখায় তার প্রবল আগ্রহ। সুনন্দও প্রাণিবিজ্ঞানের ছাত্র। এম. এস. সি পাস করে এখন রিসার্চ করছে। আপাতত সে কিছু দিন রয়েছে নবগোপালবাবুর বাড়িতে। তার রিসার্চের কাজে মামাবাবুর সাহায্য নিতে।

নবগোপাল ঘোষ বিয়ে থা করেননি। একা থাকেন। সুনন্দকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন। সুনন্দর বন্ধু হিসেবে ছোট থেকেই আমি তাকে চিনি।

আপাতগম্ভীর দর্শন, মাঝারি স্বাস্থ্য, মাঝারি হাইট, মামাবাবুকে দেখলে আর পাঁচটা সাধারণ ছাপোষা বাঙালি গেরস্থ অধ্যাপকের থেকে আলাদা করা যায় না। কিন্তু ওই মানুষটি প্রচণ্ড অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয়। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের নেশায় কত দুর্গম অঞ্চলে যে পাড়ি দিয়েছেন। অনেক সময় সুনন্দ এবং কখনো কখনো আমিও তার সঙ্গী হয়েছি।

আমার বিষয় অবশ্য ইতিহাস। এম. এ. পাস করে গবেষণা করছি। তবে সুনন্দ ও মামাবাবর সঙ্গ পেয়ে বিজ্ঞানেও যথেষ্ট আগ্রহ জন্মেছে। নতুন দেশ দেখার সুযোগ পেলে আমিও ছাড়ি না।

মিকিকে নিয়ে গেলাম মামাবাবুর কাছে, ভবানীপুর অঞ্চলে মামাবাবুর বাড়িতে। মামাবাবু মিকির পরিচয় জেনে খুব খুশি হলেন।

রাতে খাবার আগে ও পরে জমিয়ে গল্প হল। প্রধানত এশিয়া মহাদেশের বন্দরগুলিতেই মিকির যাতায়াত। বন্দরে বন্দরে তার কত আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কাহিনি। কত অজানা দ্বীপ। সে দেখেছে। কত অজানা প্রাণী ও মানুষ। গাছপালা। কত বিপদে যে পড়েছে। প্রথমে কিঞ্চিৎ আড়ষ্ট থাকলেও পরে দেখলাম মিকি দিব্যি হাসিখুশি মানুষ। তার গল্প বলার ঢংও চমৎকার।

ভালো ভালো খাবার একপেট খেয়ে মিকি মহাখুশি। জানাল যে অনেক দিন বাদে এমন খাসা ভোজ জুটল তার কপালে। জাহাজের খাদ্য তো বেজায় নীরস। কলকাতায় তার আস্তানার খাবার অতি বাজে। হোটেল রেস্তরাঁয় বেশি খরচ করে ভালো খাওয়া তার সাধ্যের বাইরে। মাইনে তো বেশি নয়। বাড়িতেও টাকা পাঠাতে হয়।

পরদিন ভোরে উঠেছে মিকি। চা জলখাবার খেয়েছে। খানিক বাদে বিদায় নেবে। মামাবাবু তখন তার বাড়ির বাগানে গাছপালার তদারকি করছেন। মিকি বাগানে গিয়ে দাঁড়ায়। আমরাও সঙ্গ ধরি।

ইদানীং মামাবাবুর এক নতুন শখ হয়েছে বাগান করা। মামাবাবুর বাড়ির পিছনে কাঠা দুই বাগান করার মতন জমি আছে। সেখানেই তার উদ্যানচর্চা। একটা ছোট গ্রিনহাউসও বানিয়েছেন।

প্রথামতো চেনা ফুল-ফলের গাছ করায় মামাবাবুর উৎসাহ নেই। নানান বিচিত্র গাছ। লাগাচ্ছেন। নিজের ফর্মুলা অনুযায়ী তাদের সার দিচ্ছেন, যত্ন করছেন। ফলাফলের নোট রাখছেন। অর্থাৎ ওই গাছপালা নিয়ে গবেষণা চলছে। হয়তো সেটাই আসল উদ্দেশ্য।

আমরা তার বাগান নিয়ে কিছু মন্তব্য করলে মোটেই আমল দেন না। নিজের তালেই। আছেন।

মিকি ঘুরে ঘুরে বাগান দেখতে দেখতে কয়েকটি গাছের সামনে এসে বলল, এই গাছ দেখেছি একটা দ্বীপে। প্রচুর। তবে সাইজে ঢের বড় বড়। আর পাতার ঝাড় অনেক বেশি।

–এগুলো কী গাছ জানো? প্রশ্ন করেন মামাবাবু।

–না। মিকি মাথা নাড়ে।

–এগুলো পোস্ত গাছ। পপি প্ল্যান্ট। যা থেকে আফিং হয়। ওপিয়াম।

–ইজ ইত? মিকি বেশ আগ্রহ দেখায়, আপনি ওপিয়াম তৈরি করেন নাকি?

–না বাবা। মামাবাবু হাসেন, তাহলে পুলিশে ধরবে। কয়েকটা মাত্র গাছ করেছি একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে।

-আফিং হয় কী ভাবে? প্রশ্ন মিকির।

–এর ফলের গা চিরে দিলে রস বেরায়। তাই শুকিয়ে আফিং হয়। আর ক্ষমত ভিতরের বিচি হল পোস্ত। বাঙালিদের প্রিয় খাদ্য। আচ্ছা তুমি কোন দ্বীপে এ গাছ প্রচুর দেখেছিলে বড় বড়? দ্বীপের লোক চাষ করে বুঝি?

–ও দ্বীপে লোকই থাকে না কেউ। শুধু বাস্তেন সাহেব ছিল। সেই বোধহয় লাগিয়েছিল।

–দ্বীপটা কোথায়?

–জাভা সি-তে। ছোট্ট দ্বীপ। বনজঙ্গলে ভরা।

–তুমি ওখানে গিছলে কেন?

–গিয়েছিলাম বাধ্য হয়ে, প্রাণ বাঁচাতে। সাধ করে কি ও দ্বীপে যায় কেউ?

–কী রকম? আমরা সবাই কৌতূহলী।

–তাহলে একটা লম্বা গল্প ফাঁদতে হয়, জানায় মিকি। বোঝা গেল যে গল্পটা বলতে তার অনিচ্ছা নেই, তবে আমরা শুনব কিনা বুঝতে পারছে না।

–বলো বলো কী হয়েছিল? আমরা তাড়া লাগাই। বাগানের বেঞ্চিতে আর বেদিতে বসি সবাই।

মিকি বলতে শুরু করে, সে প্রায় দশ বছর আগের ঘটনা। আমাদের জাহাজ ফিলিপিনস সেলিবিস লম্বক মাদুরা হয়ে যাচ্ছিল জাকার্তায়। মাদুরা ছেড়ে যাবার কিছু পরেই হঠাৎ উঠল। ঝড়। প্রচণ্ড ঝড়। তখন শীতকাল। তখন ওখানে ঝড় কমই হয়। তবে বৃষ্টি হয় প্রায়ই। ঝড়ের দাপটে ডুবোপাহাড়ে ধাক্কা লেগে আমাদের জাহাজের তলা ফুটো হয়ে ডুবতে লাগল। সবাই প্রাণ বাঁচাতে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল কাছাকাছি কোনো দ্বীপে আশ্রয় নেবার আশায়। একটা লাইফ-বেল্ট জোগাড় করে আমিও ঝাপালাম জলে। ওখানে ছোট বড় প্রচুর দ্বীপ। স্রোত আর বাতাসের টানে ভাসতে ভাসতে প্রথমে উঠলাম এক ছোট্ট ন্যাড়া দ্বীপে। সেখানে মানুষজনের বাস তো নেই-ই। গাছপালাও খুব কম। শুধু অজস্র সামুদ্রিক পাখির আস্তানা। পাখির ডিম খেয়ে কোনোমতে সেখানে দুটো দিন কাটালাম। জোর বৃষ্টি পড়ছে থেকে থেকে। কোনোরকমে পাথরের খাঁজের তলায় মাথা গুঁজে রইলাম। বুঝলাম যে এখানে থাকলে স্রেফ না খেয়ে বা ভিজে অসুখ করে মরব। মাইল দুই দূরে আর একটা দ্বীপ দেখা যাচ্ছিল, একটু যেন বড়। লাইফবেল্ট আঁকড়ে ফের জলে নামলাম। সাঁতরে হাজির হলাম ওই দ্বীপে। ওই দ্বীপেই দেখেছিলাম ওপিয়াম গাছের ঝাড়।

–সে দ্বীপে মানুষ ছিল না?

–না। ছোট্ট দ্বীপ। তবে দ্বীপে গাছপালা প্রচুর। ঝরনা রয়েছে একটা। কয়েকটা ছোট পুকুর। বড় উঁচুনিচু। সমতল জায়গা কম। মাঝখানে এক ছোট পাহাড়। গুহাও রয়েছে কয়েকটা। ঘরে দেখে আমি অবাক। কত রকম যে গাছপালা দ্বীপটায়। দেশি বিদেশি। এমন দ্বীপ জন্মে দেখিনি। রীতিমতো গা ছমছম করতে লাগল। রবার গাছ, তাল আনারস আম জাম কাঁঠাল ডুরিয়ান কফি চা পেয়ারা বাঁশ কলা তেঁতুল, আরও কত কী! কত রকম যে ফুল ফুটেছে। অনেক ফুল চোখেই দেখিনি আগে। সেখানেই এই ওপিয়াম গাছ। দেখেছিলাম।

–পাহাড়ের গায়ে একটু সমতল জায়গায় একটা ভাঙাচোরা কাঠের বাড়ি দেখলাম। কাঠ আর বাঁশ দিয়ে তৈরি। বেশ বড়ই ছিল একসময়। বুঝলাম, মানুষের বাস ছিল সেখানে। কিন্তু তখন জনমনিষ্যি নেই।

–তবে খাবার সমস্যাটা মিটল। খাবার মতো প্রচুর ফল গাছে গাছে। মুরগি আর ছাগল চরছে। বুনো। সামুদ্রিক পাখি আর তাদের ডিমও পাওয়া গেল প্রচুর। বড় একটা ডোবায় সাঁতার কাটছে পাতি হাঁস। ওই ডোবার পাশেই দেখি মস্ত মস্ত ওপিয়াম গাছের ঝাড়।

আমার সঙ্গে আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা ছিল। ওয়াটারপ্রুফ কেসের মধ্যে রাখা লাইটার। একটা গুহা খুঁজে আশ্রয় নিলাম। আগুন জ্বালালাম। ফল ও ঝলসানো মাংস খেয়ে কাটাতে লাগলাম। নজর রাখছি কোনো নৌকো বা জাহাজের দেখা যদি পাই। চারদিন বাদে দেখি দুটো বড় বড় নৌকো যাচ্ছে দ্বীপের কাছ দিয়ে। কাপড় নাড়িয়ে নানান

ইঙ্গিতে ডাকলাম তাদের। ওরা সিঙ্গাপুর যাচ্ছিল। আমার তুলে নিল। নামিয়ে দিল জাকার্তায়। বেঁচে গেলাম সেযাত্রা।

–ওই দ্বীপটা সম্বন্ধে খোঁজখবর করেছিলে? প্রশ্ন করেন মামাবাবু।

–করেছিলাম বইকি। ওখানকার লোক ওই দ্বীপটাকে বলে–বাস্তেন সাহেবের দ্বীপ। বাস্তেন আইল্যান্ড। ফন বাস্তেন নামে এক ডাচ ওই দ্বীপটায় ছিল অনেক বছর। প্রায় পনেরো বছর। বাস্তেনই নাকি দ্বীপে অত গাছপালা লাগিয়েছিল। তার আগে দ্বীপটায় তেমন গাছপালা ছিল না। তবে নারকেল গাছ ছিল। আর বুনো ঝোঁপঝাড়।

–বাস্তেন সাহেব ওখানে কী করত? মামাবাবু জানতে চান।

–অদ্ভুত লোক ছিল নাকি বাস্তেন। খেয়ালি প্রকৃতির। ওখানকার লোকদের মুখে যা শুনেছি। যৌবনে এসেছিল ইন্দোনেশিয়ায়। রবার বাগানে ম্যানেজারি করতে। চার-পাঁচ বছর ছিল আন্দালুস আর জাভায়। এই সময় দ্বিতীয় ওয়ার্ল্ড-ওয়ার বাধল। বাস্তেন কালিমাস্তান মানে বোর্নিও গিয়েছিল কাজে। স্টিমারে জাকার্তায় ফিরতে ফিরতে খবর পায় যে জাপানিরা জাভা অধিকার করে নিয়েছে। সাউথ-ইস্ট এশিয়া আক্রমণ করেছে জাপানিরা। হুড়হুড় করে এগোচ্ছে তাদের ফোর্স। জাপদের হাতে ধরা পড়ার ভয়ে বাস্তেন আর জাকার্তায় ফেরে না। জাভা সি-তে ওই একরত্তি জনমানবহীন দ্বীপে নেমে যায়। সেখানে লুকিয়ে থাকে মাসখানেক। এরপর দেশি জেলেদের নৌকায় চেপে

ছদ্মবেশে হাজির হয় আন্দালাসের তীরে। তারপর স্রেফ জঙ্গলে গিয়ে লুকোয়। গভীর অরণ্যে।

–আন্দালাস কোথায়? সুনন্দ প্রশ্ন করে।

ইতিহাসের ছাত্র আমি পাণ্ডিত্য ফলাবার সুযোগ হারাই না।

গম্ভীরভাবে জানাই, আমরা যাকে বলি সুমাত্রা, তারই লোকাল নেম।

মামাবাবু ও মিকি মাথা নেড়ে সায় দেয়। বুঝি মিকি সুমাত্রা নামটা জানে।

মিকি বলে চলে, বাস্তেন সাহেব আন্দালাসের পাহাড়-জঙ্গলে লুকিয়ে ছিল বছর দুই। কী করে যে বেঁচে ছিল কে জানে? জঙ্গল যা ঘন। যা বৃষ্টি। বিষাক্ত সাপখোপ। হিংস্র জানোয়ারও আছে। অবশ্য জঙ্গলের আদিবাসীদের ধরনধারণ ভাষা কিছুটা জানত বাস্তেন,

–যুদ্ধ থেমে গেলে বাস্তেন বেরিয়ে আসে শহরে। জাপানিরা হেরে গেছে তাই ভয় নেই আর। এরপর বাস্তেন চলে যায় নিজের দেশ হলান্ডে। কিন্তু ফিরে আসে আবার। জার্মানির আক্রমণে ওর অনেক নিকট আত্মীয় নাকি মারা গিয়েছিল। দেশে ওর ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। দেশে ওর আর মন টিকছিল না।

অনেকক্ষণ কথা বলেছে মিকি। মামাবাবু তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, এক কাপ কফি খাবে নাকি?

–তা বেশ। মিকি রাজি।

কফিতে চুমুক দিতে দিতে ফের শুরু করে মিকি, বাস্তেন বছর খানেক নানা কাজ করে। ইন্দোনেশিয়ার কয়েক জায়গায়। তারপর নাকি ওই দ্বীপে গিয়ে আস্তানা গাড়ে। চাকরি আর করেনি। বাস্তেনের গাছপালার খুব শখ ছিল। জানতও বেশ গাছপালা সম্বন্ধে। ওই দ্বীপে বাঝেন খুশিমতো গাছ পুঁততে থাকে। দেশ-বিদেশের গাছের চারা বিচি জোগাড় করে, ফুল। ফল অনেক রকম। তাই নিয়েই মেতে থাকত। সমুদ্র পেরিয়ে বড় দ্বীপের শহরে যেত। অবশ্য, তবে খুব কম। দরকার না হলে যেত না শহরে।

–স্রেফ একা গিয়েছিল? জিজ্ঞেস করি আমি।

–না। এক মালয়ি যুবককে সঙ্গে নিয়ে যায়। ওর খুব অনুগত ও বিশ্বাসী। দ্বীপে নিজের বাড়ি বানাতে কিছু দেশি মজুরকে নিয়ে গিয়েছিল কয়েকবার অল্প দিনের জন্য। পরেও মজুর নিয়ে গেছে গাছ কাটতে, জমি কোপাতে, এমনি নানা কাজে। তবে তারা বেশিদিন থাকেনি দ্বীপে।

–বাস্তেন জাভায় যাওয়া-আসা করত কীভাবে? মামাবাবু জানতে চান।

–ওদের একটা ছোট মোটর বোট ছিল তাতে। বাস্তেন এবং ওর অনুচর পো দুজনেই বোট চালাতে পারত। কখনো কখনো পো একাই ঘুরে আসত জাভায় সুমাত্রায় বোট চালিয়ে। মাঝে মাঝে জাভা থেকে নৌকা যেত ওই দ্বীপে, দরকারি খাবার-দাবার জিনিসপত্র নিয়ে। বাইরের লোক বেশি আসা পছন্দ করত না বাস্তেন। মাঝিরা যারা যেত দরকারে তাদের মুখেই লোকে শুনত বাস্তেনের নানা কথা। বাস্তেন গাছের চারা আর বীজের খোঁজে যেত জাভা সুমাত্রা আর কাছাকাছি দ্বীপে। অর্ডার দিয়ে আনাত চারা ও বীজ। দ্বীপটা তখন নাকি রীতিমতো রহস্যময় ছিল বাইরের লোকের কাছে।

–পনেরো বছর পর বাস্তেন কোথায় যায়? প্রশ্ন করেন মামাবাবু।

–যায়নি কোথাও। ওখানেই হঠাৎ সে মারা যায় অ্যাকসিডেন্টে। পাহাড় থেকে পিছলে পড়ে মাথায় চোট পায়। তখন কয়েকজন মাঝি গিয়েছিল ওই দ্বীপে,তারাই এসে প্রথম খবরটা দেয় জাকার্তায়। ওই দ্বীপেই বাস্তেনকে কবর দেওয়া হয়। ওর অনুচর পো বেশি দিন আর থাকেনি ওই দ্বীপে। বাস্তেনের মোটরবোট চালিয়ে, বাস্তেনের বন্দুকটা আর কিছু দামি জিনিসপত্র নিয়ে চলে যায় মালয়। আর তার খোঁজ পাওয়া যায়নি। তারপর থেকেই দ্বীপটা জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে। মাঝে মাঝে দেশি মাঝিরা গিয়েছে ওই দ্বীপে ফলটলের সন্ধানে। কিন্তু বাস করেনি কেউ স্থায়ীভাবে।

–তুমি বাস্তেন দ্বীপের কথা জানতে না আগে? মামাবাবুর প্রশ্ন।

–না। আসলে আমাদের দেশটা তো অজস্র দ্বীপের রাজত্ব। জাভা সি, ফ্লোরেস সি, বান্দা সি, চায়না সি, সুলু সি–এমনি কত সাগরে হাজার হাজার ছোট বড় দ্বীপ ছড়িয়ে আছে। বড় দ্বীপগুলোর মোটামুটি খবর রাখলেও খুব ছোটগুলো আমাদের প্রায় অচেনা। বিশেষত আমার। আমি যে কটা জাহাজ কোম্পানিতে কাজ করেছি তাদের জাহাজ যায় বেশির ভাগ পশ্চিমে বা উত্তরে। বড় পোর্টগুলোয় জাহাজ থামে। সেগুলো চিনি। বাস্তেন দ্বীপের গল্প করে শুধু জাকার্তার জেলেরা আর নৌকার মাঝিরা। তাদের সঙ্গে আমার তত মেলামেশা নেই। জাকার্তায় গেছি অনেকবার। তবে সেখানে জাহাজি নাবিকদের সঙ্গেই মিশেছি বেশি। তাই আগে জানতেম না বাস্তেন দ্বীপের কথা।

–তুমি অনেক পোর্টে ঘুরেছ তাই না? সুনন্দ বলে।

–ঘুরেছি বইকি। জাকার্তা, সিঙ্গাপুর, পেনাং, রেঙ্গুন, ব্যাংকক, ক্যালকাতা, কলম্বো, করাচি কতবার গেছি। এদেন ডার্বানও গেছি। ফিলিপাইনসে ম্যানিলা গেছি। ব্রিসবেন গেছি। কালিমান্তান মানে বোর্নিওতে ম্যাকাসার পোর্টে গেছি অনেকবার। ওই সব পোর্টটাউনে ঘুরেছি। সগর্বে ঘোষণা করে মিকি। বলে, তবে বেকায়দায় পড়ে খুব ছোট বা নির্জন বসতিহীন দ্বীপেও জাহাজ নোঙর ফেলেছে কয়েকবার।

আমরা হাঁ করে শুনি। ওঃ লোকটার জীবন বটে। কত ঘুরেছে। কত কী দেখেছে!

মামাবাবুর পিছু পিছু মিকি বাগানে গ্রিনহাউসে ঢোকে। খড়ের চাল, দরমার দেয়াল, ছোট লম্বাটে ঘরটায় নানান অর্কিড় ঝুলছে। ঘরটা বেশ ঠাণ্ডা। তবে রোদ ঢোকে দরমার বেডা সরিয়ে দিলে। ঘরের মেঝেতে লম্বা লম্বা কয়েকটা টবে কিছু পপি গাছ দেখে মিকি বলল, এই গাছ আমি ওই দ্বীপে দেখেছি। এর চেয়ে অনেক বড় বড় সাইজের।

–এগুলো কী ফুলের গাছ জানো? মামাবাবু প্রশ্ন করেন।

–না।

–এগুলোর নাম ক্যালিফোর্নিয়ান পপি। সত্যি তুমি এই গাছ দেখেছ বাস্তেন দ্বীপে? মিকি পপি গাছগুলোর পাতায় হাত দিয়ে দেখে বলল, আলবৎ এই গাছ। তবে সাইজে প্রায় ডবল। ফুল ছিল না মোটে। মাত্র দু-একটা ছোট্ট ছোট্ট ফুল ফুটেছিল এইরকম, এই রং-এর। হুঁ এই গাছই। এই পাতা। আমি তো ভেবেছিলাম লম্বা মোটা পাতার ঘাস। কী নাম বলছেন? পপি।

–কোথায় দেখলে? মামাবাবু জানতে চান।

–এক জায়গায় ঝরনার গা থেকে সরু নালা বেরিয়েছে, তার ধারে ধারে ছিল এই পপি গাছ। প্রচুর।

মিকি তার সমুদ্র ভ্রমণের অ্যাডভেঞ্চার আরও বলে। এমন শহুরে শিক্ষিত শ্রোতা মুগ্ধ হয়ে তার গল্প শুনছে এ অভিজ্ঞতা তার জীবনে এই প্রথম।

মামাবাবু কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক। কিছু ভাবছেন যেন? তিনি হঠাৎ বললেন, আচ্ছা মিকি ওই বাস্তেন সাহেবের চলত কীভাবে শুনেছ? মানে দ্বীপে থাকার সময় চাকরি তো করতেন না। খরচাপাতি চালাত কী করে খোঁজ পেয়েছিলে?

মিকি থমকে গিয়ে একটু ভেবে বলে, হঁ আমিও ভেবেছি ব্যাপারটা। মাঝিদের মখে শুনে যা মনে হয়েছিল বাস্তেনের অনেক জমানো টাকা ছিল জাকার্তার কোনো বাংকে। মোটা মাইনের চাকরি করেছে তো আগে। হয়তো দেশ থেকে কিছু টাকা নিয়ে এসেছিল।

তবে ওই দ্বীপে থাকার সময়েও বাস্তেনের অন্য রোজগারের পথ ছিল। লোকটি নাকি চমৎকার ছবি আঁকতে পারত। হাতের কাজ ছিল দারুণ। চামড়া আর কাগজের মুখোশ, নকশা আঁকা বাঁশের পাত্র, নানান ডিজাইনের বাতিকের কাজ করা কাপড়–এই সব বানিয়ে এনে কয়েক মাস অন্তর অন্তর বিক্রি করত জাভায়। ভালো ডিমান্দ ছিল ওর হাতের কাজের, শিল্প-দ্রব্যের। এই ভাবেই চালাত খরচ, আমার তাই মনে হয়। জাকার্তার মাঝিদেরও তাই ধারণা।

–হুম। মামাবাবু ফের আনমনা হয়ে ভাবেন কিছু। এরপর একসময় জিজ্ঞেস করেন মিকিকে, তুমি দেশে ফিরছ কবে?

–এই পনেরো-কুড়ি দিন বাদে।

–তারপর থাকবে কিছুদিন দেশে।

–থাকব। অন্তত মাস তিনেক। বাড়িঘর সারানো, চাষবাসের কাজ আছে।

মামাবাবু বললেন, শোনো মিকি, মাসখানেক বাদে আমি সিঙ্গাপুর যাব একটা কাজে। আমরা তিনজনেই যেতে পারি। গেলে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাই। তুমি সুমাত্রা মানে আন্দালাসে থাকো কোথায়?

–সুমাত্রার দক্ষিণ-পুবে পালেমবাং নামে একটা ছোট শহরের কাছে আমার গ্রাম।

–সিঙ্গাপুর থেকে তোমার সঙ্গে যোগাযযাগ করব কীভাবে? টেলিফোন বা টেলিগ্রাম করলে?

মিকি বলে টেলিফোন তো নেই আমার বাসায়। তবে গ্রামের পোস্ট অফিসে টেলিফোন করে আমায় কোনো খবর দিতে বললে জানিয়ে দেবে আমায়। হা টেলিগ্রাম করলে পাব।

জানতাম যে সিঙ্গাপুরে মামাবাবুর একটা কনফারেন্স আছে ডিসেম্বরের শেষে। সঙ্গে সুনন্দও যাচ্ছে। কথার ভাবে মনে হল আমাকেও হয়তো সঙ্গে নেবেন। মনে মনে আমি পুলকিত। কিন্তু এরপরেই মামাবাবুর কথা শুনে আমি ও সুনন্দ চমকাই।

–বুঝলে মিকি, আমি ওই বাস্তেন দ্বীপে একবার যেতে চাই। দেখব ওখানকার গাছপালা। তুমি পারবে না আমাদের গাইড হয়ে নিয়ে যেতে? সেই কদিনের জন্য তোমার যা প্রাপ্য আমি দেব। কিন্তু তোমার হেল্প চাই। আমরা তো চিনি না ওদেশ। তুমিই নৌকা ভাড়ার ব্যবস্থা করবে। খাওয়া থাকা ইত্যাদি সব খরচ আমার। দ্বীপটার গাছপালা আমার দারুণ ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে। অত কাছে গিয়েও স্বচক্ষে ওই দ্বীপ না দেখে এলে ভারি আপশোস হবে।

সুনন্দ চিড়বিড়িয়ে ওঠে, সিঙ্গাপুর থেকে ফিরেই যে আপনাকে গোয়ায় যেতে হবে অল ইন্ডিয়া জুওলজিকাল সোসাইটির কনফারেন্সে। একটা সেশনে আপনি প্রিসাইড করবেন। কথা দিয়েছেন।

–যাব না গোয়া। ওদের জানিয়ে দেব। মামাবাবু নির্বিকার।

শুনে সুনন্দ থ। আমিও। মামাবাবু তো এমন কথার খেলাপ করেন না। আমার মনে হল যে বাস্তেন আইল্যান্ড যাবার প্ল্যান মোটেই গাছগাছড়া দেখার লোভে নিছক শখের ভ্রমণ

নয়। মামাবাবুর স্বভাব জানি। অন্য কোনো গোপন উদ্দেশ্য আছে। এই নিয়ে এখন প্রশ্ন করলে আসল কারণ ভাঙবেন না। পরে হয়তো নিজেই বলবেন কারণটা।

–কি মিকি যাবে নিয়ে? মামাবাবু ফের অনুরোধ করেন সাগ্রহে।

প্রস্তাব শুনে মিকি কেমন মিইয়ে গেল। আমতা আমতা করে বলে, দশ বছরেরও আগে গিয়েছিলাম ওই দ্বীপে। আর যাইনি ওর কাছ দিয়ে। ওখানকার ছোট দ্বীপগুলো তেমন চিনি না আমি।

মামাবার মিকির দ্বিধা উড়িয়ে দিয়ে বলেন, তা লাগুক সময় খুঁজতে। দু-চার দিন নষ্ট হলে আমার ক্ষতি নেই। দ্বীপটায় পা দিলে চিনতে পারবে?

–তা পারব। দ্বীপের কয়েকটা চিহ্ন মনে আছে।

–ব্যস ব্যস তাহলেই হল।

মিকি বলে, পালেমবাংয়ে আমার চেনা একজনের নৌকা আছে। লামপুং বন্দরে তার নৌকা থাকে। ভাড়া খাটে। তাকে বললে সে ঠিক রাজি হয়ে যাবে তার নৌকা ভাড়া দিতে।

.

০২.

মাসখানেক পরের কথা।

সিঙ্গাপুর। মালয় রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তে এক গুরুত্বপূর্ণ শহর ও বন্দর। ভারতবষ, ব্রহ্মদেশ মানে অধুনা মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা ইত্যাদি দেশ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, চিন দেশ এবং প্রশান্ত মহাসাগরে পাড়ি দেওয়ার মুখে প্রধান বন্দর বলা যায় সিঙ্গাপুরকে।

মামাবাবু, সুনন্দ, আমি সিঙ্গাপুর এসেছি তিনদিন হল। মামাবাবু ও সুনন্দ তাদের। প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ে কনফারেন্স নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত থাকে। আমি এই সুযোগে সিঙ্গাপুর ঘুরে দেখি। মামাবাবু মোহনভাই প্যাটেল নামে তাঁর পূর্বপরিচিত এক যুবককে লাগিয়ে দিয়েছেন। আমার গাইড হিসেবে। মোহন আমায় ঘুরিয়ে দেখায়।

সিঙ্গাপুর আসলে একটা দ্বীপ। মেনল্যান্ড থেকে খুব কাছে। চাওড়া বাঁধ দিয়ে যুক্ত। বাঁধের ওপর দিয়ে গেছে রাস্তা ও রেল লাইন।

অটো ট্যাক্সি বা পায়ে হেঁটে হেঁটে ঘুরে দেখলাম ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, সুপ্রিম কোর্ট বিল্ডিং, ফোর্ট ক্যানিং ইত্যাদি দ্রষ্টব্য বাড়িগুলি। শহরের এক অংশে রাস্তাঘাট, বেশ

চওড়া, পাকা। সেখানের বাড়িঘর আধুনিক প্যাটার্নের। বহুতল বাড়ি প্রচুর। আবার শহরের পুরনো অংশগুলি ঘিঞ্জি। সরু অপরিচ্ছন্ন রাস্তা। বন্দরটা বহু বছর ইংরেজদের অধিকারে ছিল।

কত জাতের মানুষ যে দেখা যায় সিঙ্গাপুরে। নানা দেশের নাবিক মাঝি-মাল্লারা তো রয়েছেই, এছাড়াও এই শহরের স্থায়ী বাসিন্দা মালয়ি, আরবি, ইউরোপিয়ান ইত্যাদি। ভারতীয়রাও সংখ্যায় কম নয়। গুজরাতি, শিখ, বাঙালি, পারশি–এমনি অনেক ভারতীয় নাকি এখানে ব্যবসাবাণিজ্য বা চাকরি সূত্রে দীর্ঘকাল আছে। রয়েছে ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলির নানা জাতি এবং চিনারা। চিনারাই সংখ্যায় শহরে সবচেয়ে বেশি। গিসগিস করছে মানুষ সদা ব্যস্ত শহরটায়।

শহরের পুব দিকে এক-নাতিউচ্চ পাহাড়। বন্দরে ছোট বড় জাহাজ লঞ্চ নৌকা সাম্পান অজস্র। রাতেও কিছু এলাকায় দোকান বাজার খোলা থাকে।

কনফারেন্সের শেষ দিন রাতে মামাবাবু ঘোষণা করলেন, আমরা কাল মিকির সঙ্গে দেখা করতে রওনা দেব। মিকিকে কবর পাঠিয়েছিলাম। উত্তর এসেছে আজ।

পরদিন সকালে আমরা ফিঙ্গার পায়ার নামে জেটি থেকে একটা মাঝারি আকারের লঞ্চ চেপে বাটাম আইল্যান্ডের উদ্দেশে রওনা হলাম। পেরোচ্ছি মালাক্কা প্রণালী। বিকট শব্দ করে প্রচণ্ড গতিতে লঞ্চ ছুটল। তিনতলা লঞ্চ। উপরের দুই তলায় বসার সিটে গদি

আছে। তবে নিচের তলাটি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ও সোফা পাতা। যাত্রীর ভিড় নেই মোটে। সিট নম্বর নেই। যে যেখানে খুশি বসতে পারে। আমি ও সুনন্দ উঠলাম দোতলায়। মামাবাবু নীচের তলায় বসলেন। সমুদ্রে উদ্দাম ঢেউ। একটু ভয়ই করছিল, লঞ্চ বেসামাল না হয়। তবে স্থানীয় যাত্রীরা দেখলাম নির্বিকার। কেউ খবরের কাগজ পড়ছে, কেউ বা দিব্যি ঘুম মারছে। ঘণ্টা দুই বাদে লঞ্চ বাটাম দ্বীপে ভিড়ল। এটি ছোট্ট দ্বীপ। সিঙ্গাপুরের দিক থেকে ইন্দোনেশিয়ায় পা দেবার জন্য নিকটতম মাটি।

পর্যটকদের কাছে বোধহয় জায়গাটা তেমন আকর্ষণীয় নয়। সেখানে অল্প কয়েকটি দোকান, হোটেল, অফিস, বাড়ি। দোকানপাট খুব কম। নিরালা জায়গা। ট্যাক্সি ড্রাইভার ও হোটেল রেস্টুরেন্টের দালালরা আমাদের নিয়ে রীতিমতো টানাহ্যাঁচড়া করতে থাকে। ছোট একটা বিমানবন্দর আছে ওখানে।

মামাবাবু কিছু ডলার ভাঙালেন। ইন্দোনেশিয়ার মুদ্রার নাম রুপিয়া। আমরাও টাকাকে হিন্দিতে বলি রুপিয়া। তবে ইন্দোনেশিয়ান রুপিয়ার দাম ভারতীয় টাকার চেয়ে ঢের কম।

বেজায় গরম। বিষুবরেখা এই দ্বীপের ওপর দিয়ে গেছে। তাই এখানে সারা বছরই গ্রীষ্মকাল, আর বৃষ্টি পড়ে বছরভোর। একটা মোটামুটি হোটেলে উঠলাম।

পরদিন সকালে বাটাম থেকে বিমানে চড়ে রওনা দিলাম সুমাত্রার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে পালেমবাং। বেশ নিচু দিয়ে যাচ্ছিল বিমান। ফলে আগাগোড়াই জানলার কাঁচ দিয়ে আকাশ থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম সুমাত্রার গভীর জঙ্গল। শতশত মাইল জুড়ে যেন সবুজ কার্পেট বিছানো। কখনো কখনো দেখলাম জঙ্গলময় পাহাড়। দারুণ লাগছিল দেখতে। তবে মাঝে মাঝেই বৃষ্টির ছাঁটে জানালার কাঁচ ঝাপসা হয়ে যাওয়ায় বাইরে নজর যাচ্ছিল না।

মামাবাবু যেতে যেতে বললেন, ইন্দোনেশিয়ায় তেরো হাজারের বেশি দ্বীপ আছে। বড় পাঁচটা দ্বীপ, মানে সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও, সিলিবিস, নিউগিনির মধ্যে তিনটে দ্বীপই জঙ্গল আর পাহাড়ে ভরা। আন্দালাস মানে সুমাত্রার চেয়েও জঙ্গল পাহাড় বেশি কালিমাস্তান অর্থাৎ বোর্নিওতে আর ইরিয়ান-জায়া মানে নিউগিনিতে।

হঠাৎ মামাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় ভাষার নাম কী জানো?

নামটা ঠিক মনে পড়ছে না। আমি আমতা আমতা করি। সুনন্দ তো চুপ।

মামাবাবু বলেন, আমাদের এই দোষ। ইউরোপ-আমেরিকার কত খুঁটিনাটি খবর আমাদের মুখস্থ কিন্তু এত কাছের দেশ ইন্দোনেশিয়া, যাদের সঙ্গে আমাদের রীতিমতো আত্মীয়তা আছে বলা যায়, তাদের খবর তেমন রাখি না। এদের জাতীয় ভাষার নাম বাহাসা। বর্ণলিপি- রোমান। বাহাসা আসলে ভারতীয় শব্দ ভাষা থেকে এসেছে। বদলানো

রূপ। তবে এখানে অনেক লোকাল ভাষা আছে। ভারতবর্ষেও তো একই ব্যাপার। বড় দেশ হলে, অনেক জাতি ধর্মের বাস হলে যা হয়। তবে ভারতবর্ষ মোটামুটি একটাই ভূখণ্ড আর ইন্দোনেশিয়া ছাড়া ছাড়া অজস্র দ্বীপ। তাই এক দেশের বা দ্বীপের ভাষা দূর জায়গার লোক অনেক সময় বুঝতেই পারে না। একই জিনিসের এক এক ভাষায় আলাদা আলাদা নাম। উদাহরণ দিচ্ছি–এই যেমন পর্বতকে বাহাসায় বলে গুনুং। সুমাত্রায় বলে বকিত। ফ্লোরিস দ্বীপে বলে কেলি। বাজো উপভাষায় বলে ডোরো।

সুমাত্রায় জঙ্গলকে বলে হুতান। কিন্তু বোর্নিওতে হুতান বললে স্থানীয় লোক বুঝবে না। ওখানে জঙ্গলকে বলে সুয়াকা। জাকার্তা বলি এমনি জায়গা যেখানে প্রচুর টুরিস্ট যায়, সেসব জায়গা ছাড়া ইংরেজির চল নেই মোটে। বোঝে না লোকে। তা অবশ্য ভারতেও ইনটেরিওর গ্রামে গিয়ে ইংরিজিতে কথা বললে বুঝবে কজন? কয়েকটা শব্দ বুঝবে বড়জোর।

বুঝলাম যে মামাবাবু ইন্দোনেশিয়া সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল হয়ে এসেছেন। পাঠ্যপুস্তকের বাইরেও নিশ্চয় ভ্রমণকারীদের বিবরণ পড়েছেন। নইলে উনি তো আগে আসেননি ইন্দোনেশিয়ায়। আর আমি ইতিহাসে এম. এ. করেও কতটুকু জানি এই দেশের ভিতরের খবর?

পালেমবাং বিমানবন্দরে নামলাম। মিকি আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। এয়ারপোর্টে। মোটামুটি একটা ভালো হোটেলে নিয়ে গিয়ে তুলল আমাদের।

বেশ বড় শহর পালেমবাং। অনেক পর্যটক আসে শহরে। হোটেল ম্যানেজার বলোছল যে এখান থেকে বাসা বা গাড়িতে চেপে এক রাতের জার্নি করে যাওয়া যায় বুকলিংগাড নামে এক ছোট্ট শহরে। সেখান থেকে জিপে চড়ে ঢুকতে হয় সুমাত্রার বিখ্যাত অরণ্য অঞ্চলে। এক ধারে কেরেন্সি, আর এক পাশে সেলাট পর্বতমালা। মাঝখানে উপত্যকাগুলিতে আদিম ঘন অরণ্য। সেই অরণ্যে আছে বিরল দুই শিংওলা গণ্ডার, আছে এক জাতের কোলাব্যাং, যাদের ওজন পনেরো-কুড়ি কেজি অবধি হয়। আছে বিশাল এক জাতের সারস পাখি।

খুব লোভ হচ্ছিল শুনে। কিন্তু মামাবাবু আগ্রহ দেখাননি জঙ্গলে ঘোরায়। বরং তার মন চিন্তিত অন্য কারণে।

দেখা হতে মিকি বলেছিল যে তার পরিচিত রহিম, যার নৌকার সে ভরসা করেছিল, সেই নৌকাগুলি মাল নিয়ে ভাড়া খাটতে চলে গেছে দূরে। মামাবাবুর টেলিগ্রাম পেয়ে সে খোঁজ করে রহিমের কাছে। দিন পনেরোর আগে ফিরবে না নৌকা। কিন্তু অতদিন অপেক্ষা করা যে মামাবাবুর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই মিকি চলে গেছে জাকার্তায় নৌকার খোঁজে। বাস্তেন দ্বীপও জাকার্তা থেকে অনেক কাছে হয়।

মিকি একটা দুঃসংবাদ দিয়েছিল যে নৌকা ভাড়া পেতে একটু মুশকিল হতে পারে।

-কেন? আমরা জানতে চাই।

–কারণ ভূতের ভয়। বাস্তেনের অপঘাত মৃত্যু হয় ওই দ্বীপে। এখানে অনেক মাঝির বিশ্বাস বাস্তেন সাহেবের প্রেতাত্মা ওই দ্বীপ ছাড়তে পারেনি। অন্য লোকের থাকা সে পছন্দ করবে না। তাই ওই দ্বীপে পরে কেউ বাস করতে সাহস পায়নি। ফলটলের লোভে সাহসী কেউ কেউ ওই দ্বীপে যায় বটে। তবে দিনের বেলায়। রাতে থাকে না। ভয় পায়। মিকির পরিচিত রহিমই তাকে এসব খবর দিয়েছে। রহিম বলেছে যে বাস্তেন দ্বীপে যেতে হবে শুনলে বেশির ভাগ নৌকোই রাজি হবে না যেতে। কারণ ওটা ভুতুড়ে দ্বীপ বলে কুখ্যাত। যদি বা রাজি হয় টাকার লোভে, রাতে থাকতে চাইবে না কিছুতেই। সেই বুঝে যাও—

হুম। মামাবাবু খানিক গুম মেরে থেকে বলেছিলেন নিকিাকে, তোমারও কি ভতের ভয় আছে?

–না। দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়েছিল মিকি।

--ঠিক আছে। তাহলেই হল।

মামাবাবু মিকিকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, আমাদের আসল লক্ষ্য যে বাস্তেন আইল্যাণ্ড সেটা জাকার্তায় মাঝিদের কাছে ভেঙো না। বলবে, ওই জায়গার দ্বীপগুলো ঘুরে ঘুরে গাছপালা

জীবজন্তুর নমুনা দেখাই আমার উদ্দেশ্য। স্রেফ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান। ঘুরতে ঘুরতে বাস্তেন দ্বীপে হাজির হলে তখন একটা মতলব ভাজা যাবে।

বিকেলে আমরা তিনজন পালেমবাং শহর দেখতে বেরোলাম। একটা চেমাি‌থায় দাঁড়িয়ে মামাবাবু চারপাশে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, বহু শতাব্দী আগে ভারত থেকে এসে কিছু ভারতীয় এখানে এক হিন্দু রাজত্ব স্থাপন করেছিল। কী নাম ছিল সে রাজত্বের জানো?

–শ্রীবিজয়। গর্বিত কণ্ঠে আমি জবাব দিয়ে আড়চোখে দেখি হেরে যাওয়া সুন্দর থমথমে মুখ।

–করেক্ট। মামাবাবু খুশি। বললেন, তখন এই পালেমবাং ছিল শ্রীবিজয় রাজত্বের রাজধানী। পালেমবাংকেই বলত শ্রীবিজয়। পরে শ্রীবিজয় রাজ্যের রাজারা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে। রাজ্যের ক্ষমতা এবং সীমা অনেক বাড়ে। চতুর্থ খ্রিস্টাব্দ থেকে আট-নশো বছর শ্রীবিজয় রাজবংশ সুমাত্রায় প্রভুত্ব করে। প্রথমে হিন্দু পরে বৌদ্ধ সংস্কৃতি এই অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। নজর করে দেখ এখানকার বাড়িঘরে হিন্দু আর বৌদ্ধ সংস্কৃতির ছাপ। এখানকার নাচ-গান নাটক লোকজনের নামেও এই দুই সংস্কৃতি আর ধর্মের ছাপ পাবে। তবে সুমাত্রার চেয়ে জাভায় বৌদ্ধ প্রভাব বেশি। জাভাতেও দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দ থেকে তেরো খ্রিস্টাব্দ অবধি ভারতীয়রা এসে রাজত্ব করে। ওই দেশের রাজারা প্রথমে ছিল হিন্দু, পরে হয় বৌদ্ধ। এরপর অবশ্য ইন্দোনেশিয়ায় মুসলমান ধর্ম বেশি ছড়ায়। তবে হিন্দু আর বৌদ্ধ প্রভাব থেকে গেছে যথেষ্ট।

–এই যেমন ইন্দোনেশিয়ার ন্যাশনাল এয়ারলাইনসের নাম গারুদা। ওটা আসলে রামায়ণের গরুর পক্ষীর বিকৃত রূপ। রামায়ণের নানা ঘটনা নিয়ে এখানে নাটক হয়। তবে সীতাকে বলে সিন্তা। আর ব্রহ্মাকে বলে ব্রোমো। নাটকে পাত্রপাত্রীদের পোশাকে হিন্দু বৌদ্ধ চিনা সবধর্মের ছাপ পাবে। পাঁচমেশালি ব্যাপার।

সত্যি ভাবতে গর্ব হচ্ছিল যে এদেশে এককালে ভারতীয়রা এসেছিল এবং রাজত্ব। করেছে দাপটে।

সুনন্দ এতক্ষণ কথা বলার সুযোগ পায়নি। এবার দুম করে প্রশ্ন করে, আচ্ছা সমাত্রা জাভার লোক ভারতীয় ভাষা কিছু বোঝে? ভারতীয়রা রাজত্ব করেছিল যখন?

–না। মামাবাবু ঘাড় নাড়েন। কিছু সংস্কৃত বা অন্য ভারতীয় ভাষার শব্দ এদের ভাষায় ভেঙেচুরে ঢুকে পড়েছে বটে, কিন্তু হিন্দি, বাংলা বা খাঁটি সংস্কৃত চালালে, এখানে কেউ বুঝবে না। তবে ভারতীয় যারা দু-এক পুরুষ আগে এসেছে তারা বুঝবে। তারপর সান্ত্বনার সরে বলেন, দুঃখের কিছু নেই, সুমাত্রা জাভায় ডাচরা দেড়শো বছর ধরে বাণিজ্য করছে। রবার বাগান করেছে। কিন্তু এখানে ডাচ্ ভাষা বোঝে খুব কম লোক।

–দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ব্রিটিশ আর আমেরিকানরা এখানে ব্যবসা বাড়িয়েছে ডাচ্‌দের হাটিয়ে দিয়ে কিন্তু ইংরিজিরও তেমন চল হয়নি। ওই দু-চারটে ইংরেজি শব্দ বোঝে

মাত্র। তবে চিনা ভাষা জানলে সুবিধে হবে। চিনারা ভারতীয়দের ঢের আগে থেকে ইন্দোনেশিয়ায় আসছে। শহরে, গ্রামে-গঞ্জে বাসা বেঁধেছে। তবে অসুবিধার কিছু নেই। মিকি হবে আমাদের ইন্টারপ্রেটর। ওর মাধ্যমেই কথাবার্তা কাজকর্ম চালিয়ে যাব। নাবিকদের অনেক ভাষা শিখতে হয় মোটামুটি।

পালেমবাংয়ের রাস্তায় ঝালমুড়ি বিক্রি হচ্ছে দেখে আমরা চমৎকৃত। এক ঠোঙা করে। কিনে খেলামও আমি আর সুনন্দ। কলকাতায় দেশপ্রিয় পার্কের ধারে ঝালমুড়ি খাওয়ার স্মৃতিতে মন উতলা হয়। তবে দেশের মতন স্বাদ ভালো নয়। কী না কী মিশিয়েছে কে জানে?

মিকি জাকার্তা থেকে ফিরল পরদিন। খবর ভালো। নৌকা ভাড়া পাওয়া গেছে। আমাদের ভ্রমণের আসল উদ্দেশ্য সে ফাস করেনি। মামাবাবুর শেখানো মতো বলেছে যে কতগুলো দ্বীপে ঘুরে গাছপালা মাটি পাথর ইত্যাদির নমুনা সংগ্রহই আমাদের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান। আমরা জাকার্তা পৌঁছলেই সমুদ্রযাত্রা করা যাবে।

.

০৩.

জাকার্তা। জাকার্তা জাভা দ্বীপে। ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী। বিশাল শহর।

পালেমবাং থেকে মিকি সহ আমরা তিনজনে এয়ারোপ্লেনে চেপে গেলাম জাকার্তা। বাসে করেও যাওয়া যায়। বাসে চড়ে শহরতলি ও ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে লামপুং বন্দর। সেখান থেকে গোটা বাস যাত্রীসমেত উঠে যায় একটা জাহাজে। জাহাজ পার হয় মুন্ডা প্রণালী ঘণ্টা তিনেকে। পৌঁছয় জাভার মোরোক জেটিতে। বাস ডাঙায় নেমে ফের চলে। মোরোক থেকে জাকার্তা শহর প্রায় দশ ঘণ্টার জার্নি। এই সুন্ডা প্রণালীতেই মাথা তুলে আছে বিখ্যাত ক্রাকাউ আগ্নেয়গিরি। ১৮৮৩ সালে ভয়াবহ অগ্ন্যুৎপাত ঘটেছিল এই আগ্নেয়গিরিতে।

বাসে জাকার্তা গেলে বেশ একটা অ্যাডভেঞ্চার হত বটে কিন্তু মামাবাবু অত সময় নষ্ট করতে চাইলেন না।

জাকার্তায় একটা হোটেলে উঠলাম চারজন।

মিকি যে নৌকাটা ঠিক করেছে তার সর্দার মাঝিকে নিয়ে এল দেখা করাতে। বেশ লম্বা পোক্ত চেহারা লোকটির। মাঝবয়সি। নাম–হামিদ আলি।

হামিদ একটু গম্ভীর প্রকৃতির। অল্প কথায় আমাদের ঘোরার ব্যাপারটা ঝালিয়ে নিল। তাদের পাওনাগণ্ডা সম্বন্ধে কথা বলল। কী কী সঙ্গে নিতে হবে তার একটা ফিরিস্তি দিল। ঘাটে গিয়ে আমরা একবার দেখে এলাম নৌকোটা।

বেশ বড় পালতোলা নৌকো। ছই আছে। হাদিম ছাড়াও আরও দুজন মাঝি নৌকো বাইবে। আর একটি লোককে জুটিয়েছিল মিকি। তার নাম ফকির। বছর চল্লিশ বয়স হবে। খুব হাসিখুশি স্বভাব। সে নৌকো বাইতে জানে। আবার আমাদের টুকিটাকি কাজে সাহায্যও করবে। ফকিরের আর একটা গুণ, সে ইংরেজি কিছু বলতে পারে ও বোঝে। অল্প বয়সে সে নাকি সিঙ্গাপুরে এক ভারতীয় ব্যবসায়ীর কাছে কাজ করেছিল, তখনই ইংরেজি শেখে।

রাতে মামাবাবু আপশোস করেন, ইস জাভায় এলাম অথচ বরোবুদর দেখা হবে না।

বরোবুদরের কথা আমি তো জানিই, সুনন্দও জানে। সে সুযোগটা ছাড়ল না। পণ্ডিতি ঢঙে বলল, জানি বরোবুদর বিখ্যাত এক বৌদ্ধ স্তূপ। সেটা কি কাছাকাছি?

–না খুব কাছে নয়, বলেন মামাবাবু, যোগজাকার্তায়। যেতে আসতে দেখতে অন্তত তিন দিন লাগবে। এযাত্রা সময় নেই। দেশ বিদেশ থেকে কত লোক যায় বরোবুদর দেখতে। ছবিতে যা দেখেছি, বর্ণনা যা পড়েছি, অবাক হয়ে গেছি।

সুনন্দ বেঁফাস বলে ফ্যালে, সাঁচির চেয়েও বড়?

মামাবাবু হাসেন নিঃশব্দে। সুনন্দর অল্পবিদ্যার বহর ধরে ফেলেছেন। ক্লাস লেকচারের ঢঙে বলেন, ঢের ঢের বড়। পৃথিবীর সব চাইতে বড় বৌদ্ধ স্তূপ। প্রায় হাজার বছরের পুরনো। গোটাটা পাথরে তৈরি। গোল গম্বুজ আকৃতির। নয়টি ধাপ। একটু একটু উপরে সরু হয়ে উঠেছে। স্তূপের নিচের দিকে পাথরের দেয়ালে গৌতম বুদ্ধের জীবনকাহিনি নিয়ে অজস্র ঘটনা খোদাই করা আছে। চারপাশে বিরাট পাথরে বাঁধানো চত্বর। সেখানে প্রচুর পাথরের মূর্তি। জাভানিস এবং ভারতীয় শিল্প কর্মের মিলন ঘটেছে। অপূর্ব। ইস্ স্বচক্ষে দেখা হবে না এবার। যাগে।

সকালে কিছু কেনাকাটা করলাম আর জাকার্তা শহরটা একটু ঘুরে দেখে নিলাম। জাকার্তা অনেকটা কলকাতার মতো। একধারে প্রচুর বহুতল, আধুনিক অট্টালিকা। আবার কিছু জায়গায় বহু পুরনো ঘরবাড়ি, বস্তি। নোংরা সরু রাস্তা।

শুনলাম যে দশম থেকে ষোড়শ শতাব্দীর গোড়া অবধি এই শহর ছিল হিন্দু রাজাদের অধীনে। তখন নাম ছিল শুন্ডা কেলাপা। এরপর প্রায় একশো বছর ছিল মুসলমানদের অধীনে। তারা শহরের নাম দেয় জায়াকার্তা বা জাকার্তা। এরপর জাকার্তা অধিকার করে ডাচরা। তারা নাম দেয় বাটাভিয়া। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই শহর কিছুকাল জাপানিরা দখল করে। তারা ফের জাকার্তা নামটা চালু করে।

জাকার্তায় দেখলাম মারডেকা স্কোয়ার, জাদুঘর, ন্যাশনাল মনুমেন্ট ইত্যাদি কিছু দ্রষ্টব্য স্থান। জাদুঘরে সব চেয়ে মনে ধরে ইন্দোনেশিয়ার নানা দ্বীপের পুতুল, মখোশ, কাপড় ইত্যাদি শিল্পদ্রব্য।

আমাদের নৌকো ছাড়ল সকালবেলা।

জাভা সাগর দিয়ে চললাম পুবমুখো। তটভূমি থেকে ক্রমে সরে গভীর সাগরে চলে গেলাম। বার দুই আচমকা বৃষ্টি নামল। তখন ছইয়ের মধ্যে ঢুকে পড়ি। মাঝিদের মাথায় তাল বা খেজুর জাতীয় পাতার চওড়া কানাওলা টোকা। পরনে লঙ্গি সার্ট বা ফলপাল্ট হাফসাট। রোদ খুব চড়ে। তখন গরমে ছইয়ের বাইরে থাকা কষ্টকর। হেড মানি চাঁদ ধরেছে হাল।

সাগরের অথই জলে নৌকো যেন মোচার খোলা। ডাঙার প্রাণী আমি, বেশ অসহায় লাগে। তবে মামাবাবু ও সুনন্দর সঙ্গে এমন নৌকোয় দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার অভিজ্ঞতা আছে। আমার। ডাঙা থেকে জলের রাজ্যে এসে দৃশ্যপট একেবারে বদলে যায়। মাথার ওপর জ্বলন্ত সূর্য। চারপাশে গাঢ় নীল অতল জলরাশি। বাতাসের বেগ বাড়ালে ঢেউ ওঠে বেশি, নৌকোর ওঠানামা বাড়ে। মাঝিদের অবশ্য তাতে হেলদোল নেই।

নৌকোর পাশে পাশে হঠাৎ হঠাৎ উড়ুক্কু মাছের ঝাঁক জল ছেড়ে লাফিয়ে উঠে খানিকক্ষণ বাতাসে ভেসে ফের ডুব মারে জলে। ধারে কাছে কখনো দেখি হাঙরের লেজের

তিনকোনা ডগা জলের ওপর। সচল। দুটো বড় বড় পালতোলা নৌকো পেরিয়ে যায় অনেক দূর দিয়ে। আমাদের মাঝিদের সঙ্গে ওই নৌকোগুলোর মাঝিদের ইশারায় বার্তা বিনিময় হয় হাত ও কাপড় নেড়ে। একটা স্টিমার চলে যায় দুর দিয়ে।

নৌকোর ছইয়ে দুটো ভাগ। এক অংশে আমরা থাকি তিনজন–আমি, সুনন্দ, মামাবাবু। অন্য অংশে বিশ্রাম নেয় বাকিরা। সেখানেই রান্নার ব্যবস্থা কেরোসিন বা উনুন জ্বালিয়ে। স্তয়ের ওই অংশ জিনিসপত্রর স্টোররুমও বটে।

মামাবাবু দেখছি মিকির সঙ্গে নিচু গলায় কী সব কথা বলেন। ফকির লোকটি খাসা। চা পানের ইচ্ছে প্রকাশ করলেই সে ঝটপট চা বানিয়ে সামনে ধরে। অন্য মাঝিদেরও চা বানিয়ে খাওয়ায়। যে কারও হুকুম তালিম করতে সে সদাই হাসিমুখে প্রস্তুত।

দপরে আমরা তিনজনে শুকনো খাবার খেয়ে নিলাম। বাকিরা রান্না করে ভাত ও মাছের তরকারি খেল। সুনন্দ রন্ধনবিদ্যায় ওস্তাদ। সে মাঝিদের রান্না চেখে জানাল যে ভাতটা চলতে পারে কিন্তু মাছটা অখাদ্য। ওটা নিজেদের জন্যে আমাকেই রাঁধতে হবে। বিকেলে আমাদের নৌকো একটা ছোট দ্বীপের কূলে নোঙর ফেলল।

এ দ্বীপে মানুষের বসতি আছে। তবে মাত্র তিরিশ-চল্লিশ ঘর। দু-তিনটে কামরা নিয়ে থাকে একটা পরিবার। আমরা দ্বীপটা ঘুরে দেখি। মামাবাবু গাছপালা এবং সমুদ্রতীরে পড়ে থাকা প্রাণী নজর করেন। কিছু স্যাম্পল নেন। দ্বীপের বাসিন্দারা কিন্তু আমাদের

সঙ্গে মিশতে আগ্রহ দেখায় না। তাদের ভাষাও আমরা তিনজন বুঝি না। মাঝিরা একটা ফাঁকা ঘর চেয়ে নিয়ে সেখানে বিশ্রাম করে, রান্নার জোগাড় করে।

দ্বীপের বাড়িগুলি সুমাত্রা জাভার গ্রামের বাড়ির মতনই। বাঁশের কঞ্চির চাটাই দিয়ে তৈরি দেয়াল। মাথায় পাতার ছাউনি। মোটা কাঠের তক্তা বা বাঁশের ফ্রেমের ওপর ঘর, মাটি থেকে দু-তিন হাত উঁচুতে। এখানে প্রবল বৃষ্টি হয় সারা বছর। বৃষ্টির জল যাতে ঘর বাড়ির নিচ দিয়ে গড়িয়ে যেতে পারে তাই এইরকম ব্যবস্থা।

লক্ষ করি দ্বীপে সমর্থ জোয়ান পুরুষের সংখ্যা খুব কম। কারণটা জানায় মিকি। সে। ইতিমধ্যে ওদের সঙ্গে দিব্যি জমিয়ে নিয়েছে। এই দ্বীপে নাকি চাষবাস হয় সামান্য। কিছ ফলের গাছ আছে মাত্র। ফলে লোকের পেট ভরে না। তাই দ্বীপের সমর্থ পুরুষরা বেশির ভাগই বাইরে চলে যায় রোজগারের আশায়। দ্বীপে ফেরে কয়েক মাস বাদে বাদে, কিছু ঢাকা জমিয়ে কেনাকাটি করে। কিছু দিন দ্বীপে কাটিয়ে ফের বেরোয় দ্বীপ ছেড়ে পেটের ধান্দায়।

মামাবাবু আমাদের বললেন, মিকিকে লাগিয়েছি দ্বীপের লোকের কাছ থেকে বাস্তেন আইল্যান্ডের ডিরেকশন জানতে। মামাবাবু, সুনন্দ ও আমি রাতে থাকব তাঁবু ফেলে।

মিকি রাতে এসে বলল, প্রফেসর ভেরি সরি। এ দ্বীপের লোক মাত্র একজন বাদে বাস্তেন দ্বীপের নামই কেউ শোনেনি। শুধু এক বৃদ্ধ বলল যে হু অমন একটা দ্বীপের

কথা শুনেছি বটে বহু বছর আগে। তখন আমি জোয়ান পুরুষ। এখান থেকে উত্তর-পবে। অনেকটা গেলে কয়েকটা খুব ছোট ছোট জনহীন দ্বীপ আছে। তেমনি একটা জংলা দ্বীপে এক সাহেব বাস করত। একা। শুধু একজন এদেশি সঙ্গী নিয়ে। সেই সময় আমাদের দ্বীপের দুজন জেলে ওই দ্বীপে একবার নৌকো ভিড়িয়েছিল। ঘুরেছিল দ্বীপটায় কয়েকঘণ্টা। দেখেছিল সেই সাহেবকে। সাহেব তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেনি মোটে। ওদের ধারণা হয়েছিল যে সাহেবের মাথায় ছিট আছে। নইলে অমন দ্বীপে কেউ বাস করে?

পরে শুনেছিলাম সেই সাহেব মারা গেছে। ওই দ্বীপে এখন কেউ থাকে কিনা জানি না। পরের দিন ফের আমাদের নৌকো জলে ভাসল।

.

০৪.

একটা দ্বীপকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল আমাদের নৌকো। দ্বীপে যে মানুষের বসতি আছে বোঝা গেল তীরে কয়েকজন লোকের ঘোরাফেরা দেখে। মামাবাবু ওই দ্বীপে না থানার নির্দেশ দিলেন।

মামাবাবু চোখে দূরবিন লাগিয়ে লক্ষ করছিলেন। একবার বললেন, পিছনে একটা নৌকো আসছে আমাদের পথে।

হামিদ বলল, এদিকের কোনো দ্বীপে আসছে। অনেক দ্বীপেই লোক বাস করে।

দুপুরে হঠাৎ মেঘ করল। বাতাসের জোরও বাড়ছে। হামিদ বলল, কোথাও নোলে ভেড়ানো উচিত। বেশিক্ষণ বৃষ্টি চললে চারপাশ ভালো দেখা যায় না। নৌকো কোন্ দিকে কত দূর ভেসে যাবে কে জানে?

সত্যিই একটু বাদে তুমুল বৃষ্টি শুরু হল। তবে ঝড় ওঠেনি রক্ষে। সৌভাগ্যের বিষয় একটা দ্বীপের তটরেখা দেখা গেল কাছেই। পাল নামিয়ে ফেলে প্রাণপণে দাঁড় টেনে মাঝিরা কোনোরকমে ওই দ্বীপের কূলে নোঙর ফেলল।

দুজন মাঝি বারিধারার মাঝেই ডাঙায় উঠে গেল আশ্রয়ের সন্ধানে। ছইয়ের ঝাপের ফাঁক দিয়ে দেখি চারপাশ লেপেপুঁছে গেছে ছাঁটে। এদেশে এই এক অসুবিধা। যখন তখন বৃষ্টি নামে। কখনো কখনো প্রবল বর্ষণ। নিরক্ষরেখার খুব কাছে বলেই হয়তো এই ব্যাপার। ঘটে। তবে এখানকার লোক এই আবহাওয়ায় অভ্যস্ত।

আধঘণ্টাটাক বাদে মাঝি দুজন ফিরে এসে বলল যে দ্বীপের এধারে কোনো ঘরবাড়ি মানষের দেখা পায়নি। নেহাতই ছোট দ্বীপ। গাছপালা প্রচুর। কয়েকটা পাথরের টিলা আর ছোট ছোট গুহা দেখেছে। তার মধ্যে আশ্রয় নেওয়া যায়।

বষ্টি অবশ্য বেশিক্ষণ চলেনি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে থেমে গেল। আমরা তখন পাড়ে নামলাম। গুহাগুলোয় আর পাথরের ছাদের মতো আড়ালে আশ্রয় নিলাম। মাঝিরা রান্নার আয়োজনে লাগল। গল্পগুজবে মেতে গেল তারা।

--এক প্রস্থ চা হবে নাকি? ফকির জানতে চাইতেই আমরা মহা খুশি। লোকটি বোঝদার বটে।

সন্ধে নেমে গেল। আকাশে বাঁকা চাঁদ দেখা দেয় দরে দিগন্তবিস্তারী সাগরজলের ওপরে। সেদিন আর বাইরে বেরুনোর চেষ্টা করিনা।

পরদিন দ্বীপটা দেখতে বেরোলাম।

মাঝিরা ঠিকই আন্দাজ করেছিল। নেহাতই ছোট ভূখণ্ড। মানুষের বসতি নেই। দ্বীপের অপর পাশে বেশ উঁচু একটা পাথরের চাতাল। চাতালে বিছানো রয়েছে অজস্র ছোটবড় পাথরের টুকরো। আর নুড়ি। সেখানে গিজগিজ করছে অজস্র সামুদ্রিক পাখি। তাদের কলতানে মুখর জায়গাটা। ছোট ছোট পাখিগুলো সাদা-কালো মেশানো রং। আমাদের

আবির্ভাবে পাখিরা কিঞ্চিৎ বিরক্ত হল বটে তবে ভয় পেয়ে পালাল না উঠে। বুঝলাম মানুষের সংস্পর্শে এরা এত কম আসে যে মানুষ সুবিধের প্রাণী নয় এই বোধটাই তাদের নেই।

মামাবাবু মন্তব্য করলেন, এই দ্বীপটা কিন্তু খুব দামি।

–কেন? দামি তো কিছু দেখছি না। কিছু জংলি গাছ আছে শুধু।

–কারণ গুয়ানো। দ্বীপে এত সামুদ্রিক পাখির আস্তানা। এদের শুকনো মল জমে শক্ত হয়ে তৈরি হয় ফসফেট সমৃদ্ধ অতি দামি চাষের সার গুয়ানো। যা চেঁচে তুলে নিয়ে বিক্রি করতে চাইলে খদ্দেরের অভাব হবে না। তবে এখানে বৃষ্টির জলে কেবলই ধুয়ে যাবার ফলে গুয়ানো সার বেশি জমবে বলে মনে হয় না।

দ্বীপটায় একটা আশ্চর্য জিনিস দেখলাম।

দ্বীপের মাঝামাঝি জায়গায় খানিক উঁচুতে অনেকটা সমতলভূমি ছিল। সেখানে দেখি একটা পাথরে বাঁধানো চত্বর। কে বানাল? চত্বরটা বড় নয় বেশি। চত্বরের মাঝে প্রচুর চৌকো ছোট আকারের পাথরের টুকরো পড়ে আছে এলোমেলো ভাবে। মনে হল যে পাথরের দেয়ালে তৈরি একটা ঘর ছিল সেখানে। ভেঙে গেছে। পনেরো-ষোলোফুট লম্বা। এবং দশ ফুট মতন চওড়া ঘরের চিহ্ন বোঝা যায়। তার মাঝখানে পড়ে আছে একটা

চারকোনা ইঞ্চি ছয়েক পুরু পাথরের খণ্ড। আয়তাকার। লম্বায় তিনফুট, চওড়ায় দু-ফুট মতন।

আমিই প্রথম নজর করলাম যে ওই পাথরটার মসৃণ গায়ে খোদাই করে কী জানি সব লেখা। কিছু লেখা মুছে গেছে, চটে গেছে। মামাবাবুকে ডেকে দেখালাম। উনি তীক্ষ্ণ চোখে পাথরটা দেখে উলটো দিকে গিয়ে লক্ষ করে বলে উঠলেন, আরে এতো সংস্কৃত অক্ষর। কী লিখেছে ধরতে পারছি না? শিলালিপি জাতীয় কিছু। কয়েকটা সংস্কৃত অক্ষর চিনতে পারছি।

সংস্কৃত ভাষায় শিলালিপি এখানে? আমি ও সুনন্দ তাজ্জব।

মামাবাবু বলেন, অসম্ভব কেন? এক সময়ে এই অঞ্চলে ভারতীয়রা প্রচুর ঘরেছে। রাজত্ব করেছে। তারাই কেউ হয়তো এখানে পাথরের ঘর বানিয়ে শিলালিপিটা রেখেছিল। কী লেখা আছে আমি উদ্ধার করতে পারছি না। সুনন্দ ক্যামেরাটা বের করো। ফোটো তুলে নিই। যারা দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়া আর শিলালিপি নিয়ে রিসার্চ করেন তাদের দেখাব। মনে হচ্ছে চার লাইন লেখা ছিল।

মামাবাবু অনেকগুলো ফোটো তুললেন, পাথরের চত্বর, ভাঙা ঘর, শিলালিপি ইত্যাদির। নোটবই বের করে নোটও লিখলেন কিছু।

লেখাটা কী হতে পারে? আমি ও সুনন্দ উত্তেজিত। হতে পারে দারুণ একটা আবিষ্কার।

সেদিন মাঝিরা পুরোপুরি বিশ্রাম নিল। আগের দিন তাদের ধকল কম হয়নি। ফকির এ মিকি বেশির ভাগ সময় মাঝিদের সঙ্গে কাটাল।

মামাবাবু সুনন্দ ও আমাকে সঙ্গে নিয়ে দ্বীপের গাছপালা পাথর জমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। স্যাম্পলও নিলেন কিছু।

ফকির একটা মস্ত সামুদ্রিক কাঁকড়া ধরে এনে দিল আমাদের। সুনন্দ খাঁড়ির মধ্যে ছিপ ফেলে ধরল দুটো পেল্লাই সাইজের সামুদ্রিক চিংড়ি। চিংড়ি ধরার কায়দাটা মজার। শক্ত লম্বা সুতোর মাথায় বঁড়শিতে টোপ গেঁথে ও সোজা নামিয়ে দিল জলের ভিতর পাথরের খাঁজে। বাঁশের হাতলটা হাত দুই মাত্র। ফাতনা ডুবতেই সুনন্দ অতি ধীরে সুতো গুটোয়। জল ছেড়ে বঁড়শি বেরিয়ে আসতেই দেখি একটা বিরাট চিংড়ি প্রাণপণে আঁকড়ে আছে বঁড়শি ও সুতো, খাচ্ছে টোপ। যখন সে সুনন্দর খপ্পরে পৌঁছে গেল তখনও হুঁশ নেই, খেয়ে যাচ্ছে টোপ। সুনন্দ বলল, চিংড়ি এমন আঁকড়ে ধরে বঁড়শি সুতো যে চট করে ছাড়াতে পারে না নিজেকে।

সেদিন সুনন্দ রাঁধল কঁকড়ার রোস্ট আর বাগদা চিংড়ির কালিয়া। রান্নার প্রয়োজনীয় মশলা সে সঙ্গে এনেছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মশলার অভাব নেই। এখানে অনেক

দ্বীপকে বলে মশলা দ্বীপ। গরম মশলা, লবঙ্গ, দারচিনি, এলাচ ইত্যাদি নানা মশলার গাছ এখানে প্রচুর।

গরম ভাতের সঙ্গে চিংড়ি কাঁকড়া যা জমল। বেশ গুরুভোজন হয়ে গেল।

ফকিরের এক নতুন বিদ্যের কথা জানালাম। ও নাকি আতসবাজি বানাতে ওস্তাদ। একটা উঁচু জায়গায় নিজে হাতে তৈরি একটা তুবড়ি জ্বালল সন্ধের সময়। আর একটা হাউই ছাড়ল। দুটোই দারুণ। প্রশংসা করতে লজ্জিতভাবে জানাল যে, দেশে কাজকর্ম না জুটলে সে বাজি তৈরি করে দুপয়সা রোজগার করে। নিজের হাতে তৈরি কটা বাজি সে সঙ্গে এনেছে। কোনো দ্বীপে বেকায়দায় আটকে গেলে তুবড়ি জ্বেলে বা হাউই ছুঁড়ে সংকেত পাঠানো যায়। আমরা খুব তারিফ করলাম ওর বুদ্ধির। তখন কি ছাই জানি ওর এই বাজির কারসাজি কেন?

রাতে মামাবাবু একবার জিজ্ঞেস করলেন সুনন্দ ও আমাকে, তোমরা কি কেউ আমার কিট-ব্যাগ ঘেঁটেছিলে?

-না তো। আমরা জবাব দিই।

--টেন্টে ফিরে মনে হল আমার ব্যাগ কেউ ঘেঁটেছে। কাগজপত্রগুলো উলটোপালটা ভাবে রয়েছে। তবে টাকা কিছু খোয়া যায়নি। মানিব্যাগ তো আমার সঙ্গেই ছিল। যাহোক

টাকাকড়ি টেন্টে রেখে বেরিও না। মাঝিদের বা মিকি ফকিরের হাতটানের অভ্যেস থাকতে পারে। অভাবী মানুষ এরা। সাবধান হওয়াই উচিত।

পরদিন সকালে ওই দ্বীপ ছেড়ে ফের আমাদের নৌকো ভাসল সাগরে।

.

০৫.

ঘণ্টাখানেক নৌকো যাত্রার পরেই একটা দ্বীপের রেখা দেখা দিল সমুদ্রের বুকে। কাছে। এগোতেই দ্বীপটা মাথা উঁচু করে, স্পষ্ট হয়। দ্বীপটা নেড়া নয়। ঘন গাছগাছালির দেখা পাওয়া যায়।

এ দ্বীপে থামা হবে, না পাশ কাটিয়ে যাব মামাবাবু ঠিক করবেন। মিকি একদৃষ্টে দেখছিল দ্বীপটা। সে হঠাৎ মামাবাবুকে ফিসফিসিয়ে বলল, প্রফেসর আমার সন্দেহ হচ্ছে যেন চেনা চেনা। হতে পারে বাস্তেন আইল্যান্ড। কতগুলো চিহ্ন মনে পড়ছে।

মামাবাবু তৎক্ষণাৎ মাঝিদের নির্দেশ দিলেন, এই দ্বীপে নৌকো লাগাও। দেখব দ্বীপটা।

দ্বীপে নামলাম। মামাবাবু হামিদকে বললেন, তোমরা বিশ্রাম করো। রান্নার আয়োজন করো। আমরা দ্বীপটা ঘুরে আসছি। দেখি, নতুন কিছু গাছপালা প্রাণী চোখে পড়ে কিনা।

এত তাড়াতাড়ি বিশ্রাম পেয়ে মাঝিরা তো খুশি।

মামাবাবু, সুনন্দ, আমি, মিকি ঢালু পাড় বেয়ে উঠি। ধীরে ধীরে দ্বীপের ভিতরে ঢুকি। ফকিরও সঙ্গে আসতে চাইছিল। কিন্তু মামাবাবু তাকে বারণ করলেন। বললেন, তুমি বরং টেন্ট আর আমাদের ব্যাগগুলো এনে পাড়ে রাখো। কিছু তেমন না পেলেও একটা দিন তো লাগবে ঘুরে দেখতে। একটা রাত অন্তত কাটাতে হবে।

দ্বীপের মাঝখানটা উঁচু। নাতি উচ্চ পাহাড় যেন। ওই উঁচু জায়গা থেকে চারধারে ঢাল নেমেছে। চলতে চলতেই দেখতে পাচ্ছিলাম। মিকি মাঝে মাঝে থামে। দেখে চারপাশে। সে বুঝি কিছু চিহ্ন খুঁজছে। সহসা একটা বাঁক নিয়ে মিকি থমকে যায়। দেখি যে পাহাড়ের গা বেয়ে একটা ঝরনা নামছে। ক্ষীণ স্রোতোধারা। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে ঝরনার কিছু অংশ দেখতে পাই।

মিকি ঝরনাটা দেখতে দেখতে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, প্রফেসর এটাই বাস্তেন আইল্যান্ড। আমি নিশ্চিত। সেবারও এই ঝরনাটাকে ঠিক এই অ্যাঙ্গেলে প্রথমবার দেখেছিলাম উঠতে উঠতে। চলুন ওপরে, বাস্তেন সাহেবের ঘরবাড়িরর চিহ্ন কী কী আছে দেখতে পাবেন।

মামাবাবুর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলেন, থ্যাংক ইউ মিকি। তোমার আশা পূরণ হোক। যাক বেশি ঘুরতে হল না খুঁজতে।

আঁকা বাঁকা সরু পথ ধরে উঠি। খুব খাড়া নয় পথ। মামাবাবু যেতে যেতে আশেপাশের গাছপালা নজর করতে করতে বললেন, এখানকার গাছপালা দেখছ? অভিনব কিছু চোখে পড়ছে? এ দ্বীপে লোক বাস করত তার প্রমাণ রয়েছে। দেখ, মাঝেমাঝে পাহাড়ের গা। কেটে সমতল করা হয়েছে। আর এখানকার গাছগুলো দেখ।

তা একটু মনে হচ্ছিল আমারও। এবার খুঁটিয়ে নজর করি। সহসা একটা মস্ত ঝাকড়া গাছের দিকে আঙুল দেখিয়ে মামাবাবু বললেন, কী গাছ চিনতে পারো?

আমি দেখেই বলি, তেঁতুল না?

–হুঁ। করেক্ট। মামাবাবু মিকিকে বললেন, তুমি এ গাছটা দেখেছিলে আগেরবার।

–দেখেছিলাম। তবে অনেক ছোট ছিল। এই ছোট দ্বীপগুলোয় তেঁতুলগাছ বড় একটা। দেখা যায় না। এ গাছ প্রচুর আছে সুমাত্রা জাভা মালয়ের জঙ্গলে। তেঁতুল বিচি তো পাখিতে খায় না। ফলে দূরে সাগর দ্বীপে তেঁতুল গাছ পাখিরা বিচি ছড়ায় না। তেঁতুল গাছ সাধারণত মানুষই আনে। এ দ্বীপে বাস্তেন ছাড়া আর কেউ ছিল বলে শুনিনি। বাস্তেনই তেঁতুলের চারা বা বিচি পুঁতেছিল।

দেখা গেল এক জায়গায় পাথর কেটে সিঁড়ি বানানো হয়েছে। ক্ষয়ে গেলেও এখনো ওঠা যায় সিঁড়ি বেয়ে। খানিক সিঁড়ি দিয়ে উঠেই দেখা গেল মস্ত সমতল এক চত্বর। পাথর ও মাটি কেটে বানানো। সেখানে একদা মনুষ্য বসতির ছাপ স্পষ্ট। আমরা থমকে গিয়ে দেখি।

মিকি বলে ওঠে খুশিতে, এইখানেই ছিল বাস্তেন সাহেবের বাড়ি। আগেরবার যা দেখেছি তা নেই। বেশির ভাগই নষ্ট হয়ে গেছে। তবু বোঝা যায়। ওই দেখুন–

চত্বরের মাঝে অনেকগুলো সরু লম্বা হাত দুই উঁচু পাথরের বেদি। চৌকো ইটের মতন পাথর মাটি দিয়ে গেঁথে তৈরি। তবে বেদিগুলো ভেঙে গেছে অনেক জায়গায়। মাটি ও পাথর স্তূপ হয়ে রয়েছে জায়গায় জায়গায়। দেখে মনে হল যে ওই পাথরের বেদিগুলোর ওপর তৈরি হয়েছিল বাস্তেনের বাড়ি। ঘরগুলো হয়তো ছিল বাঁশ ও কাঠের। কয়েকটা ছোট বেদি মনে হল বসার জন্য ব্যবহার হত, যেগুলো কিছু দূরে দূরে।

অবাক কাণ্ড একটা ছোট ঘর তখনো টিকে আছে। চত্বরের এক কোণে ঘরটা। ঘরটার দেয়াল পাথরে তৈরি আর ছাদ টিনের। ছাদে টিনের পাত অবশ্য এখন রংচটা এবং ফুটো ফুটো। হয়তো ওটা গুদামঘর জাতীয় কিছু ছিল। ঘরটার দরজা জানলার পাল্লা নষ্ট হয়ে গেছে। ভিতরে আগাছার জঙ্গল। বাইরে কয়েকটা মুরগি খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে।

সুনন্দ ওই ঘরের হাঁ-করা দরজা দিয়ে ভিতরে উঁকি দিতেই মিকি তাকে সাবধান করে, ভিতরে ঢুকো না। বিষাক্ত সাপ থাকতে পারে।

সুনন্দ সভয়ে পিছিয়ে বলে, এখানে সাপ আছে নাকি?

--থাকতেই পারে। আন্দালুস আর মালয় জঙ্গলে বিষাক্ত সাপ প্রচুর। জাভাতেও আছে। সেগুলো জলে ভেসে বা নৌকো আর জাহাজের খোলে ঢুকে লুকিয়ে এই সব ছোট দ্বীপে হাজির হয়। বান্দা সাগরে একটা ছোট দ্বীপে লোকে তো কিং কোবরার ভয়ে মোটে পা দেয় না। আগে ছিল না ওখানে। কী করে যে এসে ওই দ্বীপে আস্তানা গেড়েছে। দ্বীপটায় প্রচর এলাচ হয়। কয়েক ঘর লোক বাস করত দ্বীপটায়। তারা সবাই কিং-কোবরার ভয়ে পালিয়েছে দ্বীপ ছেড়ে। সাপগুলো মারার চেষ্টা হচ্ছে সরকার থেকে।

মামাবাবু বললেন, তা বটে। সুমাত্রা আর মালয় জঙ্গলে কিং-কোবরা মানে শঙ্খচূড় সাপ সাইজে পৃথিবীর সেরা। বারো-চোদ্দ যুট অবধি লম্বা হয়। ওদের সব প্রাণী ভয় পায়। যা সাংঘাতিক বিষ আর তেড়িয়া মেজাজ। তবে এখানে কিং কোবরা নেই। তাহলে কি আর মুরগিগুলো নিশ্চিন্তে মাটিতে চড়ে বেড়ায়।

মিকি বলল, শুধু মুরগি কেন, এখানে ছাগল আর পাতিহাঁস আছে। আমি আগেরবার দেখেছি। নিশ্চয় বাস্তেন সাহেবের আমদানি। এখন বুনো হয়ে গেছে।

নারকেল গাছের কথা ধরছি না। গোটা ইন্দোনেশিয়ায় সর্বত্র নারকেল গাছের ছড়াছড়ি। আপনি জন্মায়। বাড়ে। নারকেলের খোলা ছোবড়া দিয়ে ইন্দোনেশিয়ায় নানান শিল্পবস্তু বা কাজের জিনিস তৈরি হয়। নারকেল তেল হয়। শাঁস খায়। যেমন ভারতের দক্ষিণ অঞ্চলে। এ দ্বীপেও নারকেল গাছ প্রচুর। তবে আমাদের লক্ষ্য অন্য বিশেষ ধরনের গাছপালা কী আছে এ দ্বীপে।

চত্বরের একধারে একটা গাছ দেখে আমরা চমৎকৃত। আমগাছ।

মিকি বলল, ম্যাংগো ট্রি এই দ্বীপে আরও আছে। তবে ইন্ডিয়ান ম্যাংগোর মতন খেতে ভালো নয়। আমি খেয়ে দেখেছি আগের বার। এ গাছও হয়তো বাস্তেন লাগিয়েছিল জাভা সুমাত্রা থেকে এনে।

চত্বরে তখনো কিছু লোহা টিন অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি ধাতুর ভাঙা রড পাত্র ছড়িয়ে পড়ে ছিল। সব ধাতুই মরচে ধরা। গাছের ডালে তখনো ঝুলছে কিছু ভেঁড়া দড়ি আর ক্যানভাসের টুকরো। তখনো কয়েকটা মোটা কাঠের গুঁড়ি মাটিতে শুয়ে বা বেদির গায়ে হেলান দেওয়া অবস্থায় রয়েছে, তাদের গায়ে পুরু শ্যাওলার আস্তরণ। এসব চিহ্ন সুদূর অতীতের স্মৃতিকে জাগায়, বিষণ্ণ করে মন। এই কারণেই এই দ্বীপে এলে বাইরের লোকের ভীষণ ভাবে বাস্তেনকে মনে পড়ে। এ যে তার অতি প্রিয় বাসভূমি ছিল। ফলে মনে জাগে বাস্তেনের অলৌকিক উপস্থিতির গা ছমছমে অনুভূতি। সাদা বাংলায় বাস্তেনের প্রেতাত্মার ভয়।

চত্বরের একধারে কয়েকটা ফুল গাছ দেখে আমরা অবাক। পাঁচটা পরপর বেলফুলের গাছ আর একটা গন্ধরাজ। বেলফুলের গাছগুলো মস্ত ঝকড়া হয়েছে আর গন্ধরাজটাও বিরাট। প্রচুর জল পাওয়া ফল। ফুলে ফুলে ভরে গেছে সব গাছ। কাছে যেতেই পাই বাতাসে ভেসে আসে সুবাস। বাঃ ফন বাস্তেন পুষ্পবিলাসীও ছিলেন।

মামাবাবু কিন্তু বাস্তেনের পোডড়া ভিটে দেখতে আধঘণ্টাও কাটাতে চাইলেন না। মিকিকে তাড়া লাগালেন, সেই ওপিয়াম গাছগুলো কোথায় দেখেছিলে? নিয়ে চলো। দেখব।

ঝরনার ধারে ধারে নামলাম কিছুটা। মূল ঝরনা থেকে একটা সরু শাখা ডান ধারে বেরিয়ে গেছে এক জায়গায়। মিকি এবার ওই শাখা স্রোত অনুসরণ করল। পিছু পিছু আমরা। ঝরনা স্রোতে মাটি ধুয়ে পাথর বেরিয়ে পড়েছে। হলদে এবং লালচে কালো রং-এর পাথর। স্রোতোধারার আশেপাশে ছড়িয়ে ছিল অজস্র পাথুরে নুড়ি।

শাখা স্রেতটি খানিক গিয়ে পড়েছে গোল কড়াইয়ের আকারের এক নিচু জায়গায়। সেখানে ছোট এক ডোবা সৃষ্টি হয়েছে। ডোবা থেকে বাড়তি জল উপচিয়ে ফের ক্ষীণ স্রোতোধারায় নেমে গেছে আর এক দিকে গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে। ওই ডোবার চারধাবেই দেখলাম পোস্ত গাছের ঘন ঝোঁপ। মানে যা থেকে হয় আফিম বা ওপিয়াম। মামাবারক বাগানে এই জাতীয় গাছই দেখেছি। তবে এখানকার পোস্ত গাছ অনেক বেশি সতেজ, বড় ও ঝাকড়া। গাছগুলোয় কিছু হলুদ ফুল ফুটে আছে।

মামাবাবু অনেকক্ষণ মনোযোগ দিয়ে গাছগুলো নজর করলেন। তারপর ব্যাগ থেকে সরু বেঁটে শাবল বের করে ওখানকার মাটি খুঁড়ে তুলে দুটো ছোট প্লাস্টিকের কৌটোয় ভরলেন। ওখান থেকে কিছু নুড়ি পাথরও নিলেন স্যাম্পল হিসেবে। শিশিতে নিলেন ঝরনার জলের স্যাম্পল। সব স্যাম্পল ব্যাগে ভরলেন। তারপর মিকিকে বললেন ক্যালিফোর্নিয়ান পপি কোথায় দেখেছিলে? এখানে তো দেখছি না?

–ছিল। দেখেছি আমি। এখান থেকে খানিক দূরে যেতে হবে। তবে এতদিনে ৯, আছে কিনা জানি না? জানায় মিকি।

কখনো গাছ পালার ফাঁকে ফাঁকে সরু পথ ধরে, কখনো খোলা আকাশে মাথার ওপর গনগনে সূর্য দেখতে দেখতে, ফের কটা বড় গাছের ঘন ছায়ায় এসে মিকি বলল, এইখানে দেখেছিলাম সেই গাছ। সেখানে ওপরে ঠাস পাতার আচ্ছাদন থাকায় নিচে রোদের তাত খুব কম। দিব্যি ঠাণ্ডা জায়গাটি।

মামাবাবু তীক্ষ্ণ নজরে খুঁজতে থাকেন। মিকিও। মিকিই দেখতে পায় প্রথমে, ওই তো।

তাই বটে। বড় বড় পুরু পাতা ঘাসের মতন এক টুকরো জায়গায় ওই ধরনের পপি গাছ কার্পেটের মতো বিছিয়ে আছে। দু-চারটে গোলাপি ফুল ধরেছে লম্বা বোঁটার ডগায়।

মামাবাবু ভালো ভাবে পরীক্ষা করে বললেন, হুঁ। ক্যালিফোর্নিয়ান পপিই বটে। তবে ঠাণ্ডা দেশের উদ্ভিদ তাই ছড়ায়নি তেমন, ফুলও ফোটেনি। তবে গাছগুলো বেশ পুরুষ্ট।

ওই পপি গাছ এবং সেখানকার মাটি স্যাম্পল হিসেবে সংগ্রহ করে ব্যাগে পুরলেন। মামাবাবু। বললেন, আপাতত ফেরা যাক। তোমাদের খিদে পায়নি?

পেয়েছে বইকি। সঙ্গে খাবারও আছে। মামাবাবুর ভয়ে কথাটা তুলতে সাহস পাইনি। এতক্ষণ। এখন উনি এমন ভাব দেখাচ্ছেন যেন আমরাই গা করিনি।

নৌকোর কাছাকাছি গাছের ছায়ায় আমরা খেতে বসলাম। মামাবাবু মিকিকে বললেন, আমরা শুকনো খাবার খাব। তুমি কী খাবে? আমাদেরটা? না মাঝিদের রান্না ভাত মাছ? মিকি সলজ্জভাবে জানায়, ভাত মাছ।

–বেশ। আমরা এখানে খাচ্ছি। তুমি মাঝিদের সঙ্গে খেতে যাও। খেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে যাচ্ছি। তারপর তাঁবু খাটাব।

মিকি চলে যায়।

আমরা খাচ্ছি স্যান্ডুইচ, পাকা কলা, সিদ্ধ ডিম। হঠাৎ হন হন করে হাজির হল মিকি। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, মুশকিল হয়ে গেছে।

–কী ব্যাপার?

মিকি বলল, মাঝিরা টের পেয়ে গেছে এটা বাস্তেন আইল্যান্ড। ওরা আর এখানে থাকতে চাইছে না।

–কী করে বুঝল? আমরা জানতে চাই।

–দুজন মাঝি গিয়েছিল দ্বীপের ভিতর খাবার জল আর রান্নার কাঠকুঠো জোগাড় করতে। ওরা ঘুরতে ঘুরতে দেখে ফ্যালে বাস্তেন সাহেবের পোড় ভিটে। ওদের একজন আগে এসেছিল একবার এই দ্বীপে। জানত এটা বাস্তেন আইল্যান্ড। অন্য মাঝিরা চিনত না। তারা আসেনি আগে। তবে এই দ্বীপের দুর্নাম শুনেছে। শুনেছে, এটা নাকি ভুতুড়ে দ্বীপ। যে এসেছিল তার কাছে শুনে অন্য মাঝিরাও ভয় পেয়ে গেছে। থাকবে না বলছে।

মামাবাব বললেন, কিন্তু আমার যে এ দ্বীপে কয়েক দিন থাকতেই হবে। ওরা যাণ আমাদের ফেলে নৌকো নিয়ে পালায় ওদের পাওনা আমি দেব না, বলে দিও।

একটু ভেবে মামাবাবু বললেন, বাস্তেন দ্বীপে রাতে থাকতেই তো ভয় এদের?

–হাঁ তাই।

–তবে একটা প্রস্তাব দাও মাঝিদের। দিনের বেলা ওরা কাটাক এখানে। অন্ধকার হবার আগেই চলে যেতে পারে কাছে কোনো দ্বীপে রাত কাটাতে। পরদিন সূর্য উঠলে আসুক এখানে। বাস্তেনের ভিটের কাছে যাবার দরকার নেই ওদের। সমুদ্র তীরেই কাটাক। আমাদের যতটুকু পারে সাহায্য করবে এখানে। আবহাওয়া খারাপের জন্য কোনো কোনো দিন এখানে না এলেও আমার আপত্তি নেই। মোট কথা আমাদের ফেলে রেখে দেশে পালানো চলবে না। এই দ্বীপের গাছপালা এবং আরও কিছু কিছু জিনিস আমি খুটিয়ে দেখব। এতদূর কষ্ট করে আসা কি বৃথা যাবে? আচ্ছা তুমি কী করবে?

মিকি বলল, আমি এখানেই থাকব। বলেছি তো আমার ভূতের ভয় নেই।

–ভেরি গুড। যাও। চটপট জানাও মাঝিরা কী ঠিক করল। বলো যে তাদের এই বাড়তি খাটুনি আমি পুষিয়ে দেব বেশি টাকা দিয়ে।

মিকি চলে যায় চিন্তিত মুখে। আমি ও সুনন্দও চিন্তিত। আমাদের এখানে ফেলে রেখে মাঝিরা নৌকো নিয়ে চম্পট দিলেই গেছি। কীভাবে উদ্ধার পাব তাহলে? প্রাণের চেয়ে কি টাকার লোভ বেশি? অথচ মামাবাবু যা জেদি নিজের ইচ্ছে থেকে এক চুলও সরবেন না। তাতে যা বিপদই ঘটুক। মাঝিরা পালাতে চাইলে মিকি কি আর থাকবে আমাদের সঙ্গে? সেও পালাবে ঠিক। দুশ্চিন্তায় চুমুক দিতে ভুলে গিয়ে কফি ঠাণ্ডা করে ফেলি।

মিকি ফিরে আসে ঘণ্টাখানেক বাদে। মুখে খুশি।–হ্যাঁ মাঝিরা রাজি হয়েছে মামাবাবুর শর্তে। কাছে যে দ্বীপ থেকে আমরা এখানে এসেছি সেখানে তারা ফিরে যাবে সন্ধের আগে। আমাদের সাহায্য করবে দিনের বেলা।

শুনে আমরা উৎফুল্ল। হাঁপ ছাড়ি। মামাবাবু বললেন, ওদের এ দ্বীপে বেশি ঘোরাঘুরির দরকার নেই। আমাদের রান্না করে দিলেই চলবে। আচ্ছা ফকির কী করতে চায়?

মিকি জানাল, ফকির আমাদের সঙ্গে বাস্তেন দ্বীপেই থাকবে বলেছে। মানে রাতেও।

–ওর বুঝি ভূতের ভয় নেই?

একেবারে নেই তা নয়। তবে ও আমার সঙ্গে থাকতে চায়। আসলে আমায় খুশি করতে চায়।

–কেন?

মাইনে দিচ্ছি আমি।

মামাবাবু অবাক।

–হাঁ আপনি ওর বস্ ঠিক কথা। কিন্তু আমি যে ওকে চাকরিটা পাইয়ে দিয়েছি। সেই কৃতজ্ঞতায়–

–একটু খোলসা করে বলো। মামাবাবু ভুরু কোঁচকান।

বারকয়েক চোখ পিটপিট করে ইতস্তত ভাবে মিকি জানায় রহস্যটা।

জাকার্তায় কয়েকটা নৌকোর মাঝিদের সঙ্গে কথা বলার পর মিকি হামিদের সঙ্গে কথা পাকা করে। কোথায় কোথায় যেতে হবে, কী কী করতে হবে ইত্যাদি জানানোর পর দরাদরি করে ভাড়া পাওনাগণ্ডা ঠিক হয়। হামিদের কাছ থেকে চলে আসছে মিকি তখন হঠাৎ ফকির মিকিকে পাকড়াও করে। মিকি আগে চিনত না ফকিরকে। ফকির মিকিকে করুণ কণ্ঠে জানায় যে তার একটা চাকরির খুব দরকার। যে নৌকোয় ফকির কাজ পেয়েছিল, গ্রাম থেকে ফিরতে দেরি হওয়ায় সেই নৌকো ফকিরের জন্য অপেক্ষা না করে ছেড়ে গেছে। অতএব ফকির এখন বেকার। বাড়িতে তার সংসার আছে। গরিব মানুষ সে। বেশি দিন কাজ না করে কি তার চলে? মিকি যদি তাকে একটা কাজ জুটিয়ে দেয় এই নৌকো যাত্রায় সে বড় কৃতজ্ঞ হবে। মিকিরা বেরুচ্ছে শিগগিরি সে জেনেছে। ফকিরের পুরোনো চেনা নৌকোয় ফিরতে অন্তত মাসখানেক লাগবে। এখনো সে কোনো কাজ জোটা পারেনি। মাইনে সে বেশি চাইবে না। সবরকম কাজই সে জানে–

মিকির দয়া হয়। সে হামিদকে অনুরোধ করে ফকিরকে ওর নৌকোয় কাজ দিতে। হামিদ প্রথমে মোটেই রাজি ছিল না ফকিরকে নিতে। মিকি ধরাধরি করতে বলে যে বেশ চলুক সঙ্গে তবে ওর মাইনে আমি দিতে পারব না, শুধু খাওয়া দেব। মিকি তখন চালাকি করে ফকিরের মাইনের টাকাটা হামিদের নৌকো ভাড়ার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে মোট ভাড়া কত লাগবে জানায় মামাবাবুকে। পুরো ব্যাপারটা আর ভাঙেনি মামাবাবুর কাছে। এই জন্যেই আমায় একটু স্পেশাল খাতির করে। এই আর কি–মিকি সলজ্জ ভাবে জানায়।

–হুম। ফকিরের আসল বস্ তাহলে তুমি। আমি নয়। মামাবাবু টিপ্পনি কাটেন। মিকি অপ্রতিভ। বলে, তা লোকটা সত্যি কাজের। তাই না?

মামাবাবু বললেন, বেশ চাইলে থাকুক ফকির। তোমার সঙ্গে থাকবে ছোট তাঁবুটায়। আমরা থাকব বড় দুটো তাঁবুতে। আমাদের শোবার ক্যাম্প খাট আছে। তোমরা বাঁশের মাচা করে তার ওপর বিছানা পেত। এখানে তো মাটিতে শোয়া যাবে না। যা বৃষ্টি।

মিকি মহা খুশি হয়ে দৌড়াল ফকিরকে খবর দিতে।

তাঁবু খাটাতে, জিনিসপত্র গোছগাছ করতে করতে সেই দিনটা কেটে গেল। সূর্য ডোবার ঢের আগেই হামিদ তার দুই সঙ্গীসহ নৌকো নিয়ে চলে গেল কাছের দ্বীপে –যেখানে শিলালিপি পাওয়া গেছে, সেই দ্বীপটায়।

.

০৬.

পরদিন সকালে মামাবাবু মোটেই বেরুলেন না নিজের তবু ছেড়ে। সকালে টিফিন খেয়ে আমাদের বললেন, আমার কিছু কাছ আছে। বেরুব না। তোমরা দুজন মিকিকে নিয়ে ঘুরে এসো দ্বীপে। ফকির থাক এখানে। রান্নাবান্না করবে। মাঝে মাঝে আমার চা করে দেবে। দপরে খাবার আগে আমায় একদম ডিসটার্ব করবে না।

মামাবাবুর এই ধরনের আচরণের কারণ জানি। গভীর কোনো চিন্তায় ডুবে থাকলে তিনি একা থাকতে চান। তখন অন্য কারও সঙ্গে কথাবার্তা পছন্দ করেন না।

আমি ও সুনন্দ খুশি হয়েই মিকিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। যাবার আগে দেখি মামাবাবু তার সেই বাক্সটা ঝাড়পোঁছ করছেন।

মামাবাবু একটা হালকা অথচ মজবুত মাঝারি আকারের বাক্স এনেছিলেন। তাতে ছিল বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রয়োজনীয় কিছু যন্ত্রপাতি, মালমশলা।

দ্বীপটা বেরিয়ে দেখতে দেখতে আমাদের বিস্ময় বাড়ে। কত রকম যে গাছ সেখানে। কত রকম ফল ফুলের গাছ। দেশি বুনো ঝোঁপঝাড় তো রয়েছেই। তার মধ্যে মিশে আছে নানান দেশের ভালো ভালো গাছ। বোঝা যায় ওসব গাছপালা এখানে আপনা আপনি জন্মায়নি। কেউ এনে লাগিয়েছে। কে আর হবে ফন বাস্তেন ছাড়া?

একটা গাছ দেখে থমকে যাই। কাঁঠাল। কচি কচি এঁচোড় ঝুলছে ডালে। মস্ত গাছ।

মিকি বিজ্ঞের মতন বলে, জ্যাক ফ্রুত। আন্দালাসে আমরা বলি নাংকো।

–আন্দালাস মানে সুমাত্রায় কাঁঠাল গাছ আছে বুঝি? আমি জানতে চাই।

–আছে। তবে বেশি নেই। ডুরিয়ানই বেশি হয়।

–ডুরিয়ান কী রকম ফল?

-এই তোমাদের জ্যাক ফ্রুতের জাত। তবে একটু অন্য রকম। ফুটবলের মতো গোল। গায়ে বড় বড় খোঁচা খোঁচা কাটা। স্বাদ ইন্দিয়ান কঁঠালের মতো ভালো নয়। বেশি মিষ্টি। আমি ইন্ডিয়ান জ্যাকফ্রুত খেতে বেশি ভালোবাসি।

সুনন্দ বলল, ফাসক্লাস। গাছপাঁঠার কালিয়া রাঁধব। মিকি পাড়োত ভাই ওই তিনটে এঁচোড়। এই গাছের তলায় রেখে যাই। বোঁটা থেকে আঠা ঝরে যাক। ফেরার পথে তুলে নেব।

ঘুরতে ঘুরতে সহসা তীব্র মিষ্ট সুগন্ধ পাই। এদিক-সেদিক তাকাতে তাকাতে চোখে পড়ে কিছুটা ফাঁকায় বিরাট এক মুচকুন্দ ফুলের গাছ। ফুলে ফুলে ভরা। গাছের নীচে পড়ে আছে অজস্র আধশুকনা বা শুকনো ফুল। কিছু টাটকা ফুল পেড়ে পকেটে পুরলাম। তাঁবুতে জল ছিটিয়ে পাত্রে রাখলে চমৎকার গন্ধ ছড়াবে।

গাছতলায় বসে এক রাউন্ড চা খাওয়া হল ফ্লাস্ক থেকে ঢেলে। ঝরনার জলে আরাম করে স্নান করলাম। একটু বাদে তাঁবুতে ফিরি।

তাঁবুতে পৌঁছে উঁকি দিয়ে দেখলাম মামাবাবু তার তাঁবুর ভিতরে একটা ফোল্ডিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। টেবিল ভর্তি টেস্টটিউব, বার্নার, নানান সাইজের বাটি প্লেট ইত্যাদি সরঞ্জাম। নিবিষ্ট চিত্তে মামাবাবু একটা টেস্ট-টিউবের মধ্যে তরল পদার্থ দেখছেন। আমাদের আগমন বুঝি টেরই পেলেন না। আমরাও ডাকি না তাঁকে।

মাঝিরা যখন আমাদের দুপুরের খাওয়া পরিবেশনের উদ্যোগ শুরু করেছে মামাবাব। তখন তার তাঁবু থেকে নিজেই বেরিয়ে এলেন, বেশ প্রফুল্ল বদনে। আমরা যা যা দেখেছি রিপোর্ট করলাম মামাবাবুকে।

খাওয়ার পর মামাবাবু আবার ঢুকে গেলেন নিজের তাঁবুতে। বিকেল অবধি ব্যস্ত থাকলেন কী সব গবেষণায়। আমি ও সুনন্দ থাকতাম অন্য একটা তাঁবুতে। তোফা ঘুম দিলাম দুপুরে। বিকেলে সমুদ্রের ধারে বসে আড্ডা মারলাম দুজনে। ফকির লোকটির নজর খুব। না চাইতেই দুবার আমাদের সামনে গরম চা ধরে দিল।

পরদিন মামাবাবুও আমাদের সঙ্গে দ্বীপটা ঘুরতে বেরোলেন। মিকিও চলল সঙ্গে। মাঝিরা ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে বাস্তেন আইল্যান্ডে। ফকির গল্প জুড়েছে ওদের সঙ্গে।

আমরা বেরোবার আধঘণ্টার মধ্যেই আকাশে কালো মেঘ ঘনিয়ে এল। বৃষ্টি নামতে পারে যে কোনো সময়। সুনন্দ বলল আমায়, চ, তাঁবু থেকে আমাদের বর্ষাতি আর ছাতাগুলো নিয়ে আসি। বেশি জোরে বৃষ্টি নামলে কোনো আড়ালে দাঁড়িয়ে যাব। সাধারণত সকালের দিকে বৃষ্টি বেশিক্ষণ থাকে না। গোটা সকাল তাঁবুতে কাটানো ভারি একঘেয়ে ব্যাপার। মামাবাবু এবং মিকিরও তাই মত। দুজনে জোরে পা চালিয়ে তাঁবুর দিকে হন্টন দিলাম।

মামাবাবুর তাঁবুতে যাই প্রথমে। পর্দা সরিয়ে ভিতরে উঁকি মেরেই আমরা থ। কে একটা লোক মাটিতে বসে। তার সামনে মামাবাবুর ব্যাগ থেকে বের করা কাগজপত্র ছড়ানো। আমাদের আসার শব্দে লোকটা মুখ ফেরায়। লোকটা বেঁটে। মোঙ্গোলিয়ান বা চিনা জাতীয়। ফুলপ্যান্ট ও হলুদ স্পোর্টস গেঞ্জি পরনে। সে তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁবুর অন্য ধার দিয়ে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না–সুনন্দ বডি থ্রো দিয়ে ওর

কোমর ধরে ওকে সুষ্ঠু নিয়ে মাটিতে পড়ল। লোকটা অতি তৎপর। সে গা মুচড়ে পাকাল মাছের মতো সুনন্দর হাত ছাড়িয়ে উঠে বসে, তারপর তার পোশাকের আড়ালে লুকানো লম্বা একটা ছুরি ঝট করে বের করে উঁচিয়ে ধরে সুনন্দকে তাক করে। হয়তো মেরেই বসত ছুরি কিংবা ভয় দেখিয়ে পালাত। আমি আর রিস্ক নিই না। একটা টিনের ভারী পাত্র ছুঁড়লাম লোকটার হাত লক্ষ্য করে। ঘা খেয়ে ছুরি ছিটকে গেল লোকটার হাত থেকে। সে ঝাঁকিয়ে ওঠে ব্যথায়। এই সুযোগে আমি ডাইভ দিয়ে পাকড়ে লোকটাকে পেড়ে ফেলি মাটিতে। সুনন্দও তাকে চেপে ধরে।

দড়ি দিয়ে লোকটার হাত পা শক্ত করে বেঁধে মাটিতে ফেলে রাখি। সুনন্দ ছুটল মামাবাবুকে খবর দিতে।

মামাবাবু ও মিকি এসে লোকটাকে দেখে অবাক। কে এ? কী উদ্দেশ্যে আমাদের জিনিস হাতড়াচ্ছিল? এই নির্জন দ্বীপে চোর! এখানে যে আর কেউ বাস করে তার কোনো চিহ্ন তো চোখে পড়েনি!

মামাবাবু মাঝিদের ডাকলেন। ফকিরও আসে। হামিদ লোকটাকে দেখেই বলে ওঠে, আরে এতো খ্যাপা চিয়াং! ও ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলোয় গুপ্তধন খুঁজে বেড়ায়। কুখ্যাত জলদস্যু তাই-চুংয়ের গুপ্তধনরত্নের ভাণ্ডার, বহু বছর খুঁজছে চিয়াং। এই ওর নেশা মানে পাগলামি বলতে পারেন।

হামিদের মুখে শুনি তাই-চুং বৃত্তান্ত–

প্রায় দেড়শো বছর আগের জলদস্যু তাই-চুং। দাপিয়ে বেড়াত ইন্দোনেশিয়ার সমুদ্রগুলিতে। সে সময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জলদস্যুদের ভীষণ উপদ্রব ছিল। চিনা পর্তুগিজ মালয়ি-বর্মি ইত্যাদি নানা দেশের বোম্বেটের উৎপাত। দামি মশলার লোভে এবং ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য করতে এখানের সাগরগুলি দিয়ে যাতায়াত করত কত দেশের বাণিজ্যপোত। ধনী সওদাগরদের বড় বড় নৌকো বা জাহাজ। জলদস্যুরা ওঁৎ পেতে থাকত সেই সব বাণিজ্যপোত লুঠ করতে। বণিকদের সঙ্গে যদিও আত্মরক্ষার জন্য সশস্ত্র সৈনিকরা থাকত তবু অনেক সময় তারা বাঁচাতে পারত না নিজেদের মাল ও প্রাণ।

প্রবাদ আছে তাই-চুং ইন্দোনেশিয়ার কোনো এক জনহীন ছোট্ট সাগর দ্বীপে তার লুণ্ঠন করা ধনরত্ন লুকিয়ে রাখত। চুং নিজে এবং তার ঘনিষ্ঠ কয়েকজন সাগরেদ ছাড়া কেউ জানত না সেই দ্বীপের হদিস বা কোথায় কীভাবে লুকনো আছে চুংয়ের গুপ্তধন। একবার আচমকা এক ডাচ যুদ্ধজাহাদের সামনে পড়ে যায় চুংয়ের জাহাজ। ডাচ সামরিক জাহাজের গোলার আঘাতে ডুবে যায় চুংয়ের জাহাজ। বোম্বেটে জাহাজের কেউ প্রাণে বাঁচেনি। চুং এবং তার যে ক-জন সহচর জানত ওই গুপ্তধনের ঠিকানা তারা সবাই মারা পড়ে সেবার। ফলে চুংয়ের গুপ্তধনের হদিস লুপ্ত হয়ে যায়। তব খোঁজ চলে। প্রবাদ আছে চুংয়ের গুপ্তধন নাকি বিপুল। কেউ খুঁজে পায়নি আজও। সামান্য দু-চারটে ক্লু বা কিংবদন্তি নির্ভর করে খোঁজা। সবাই এখন প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছে শুধু এই চিয়াং ছাড়া।

চিয়াং দক্ষ মাল্লা। বছরে কয়েক মাস কাজ করে। আর বাকি সময় খুঁজে বেড়ায় চুংয়ের গুপ্তধন। এ তার এক উদ্ভট নেশা। পাগলামি। লোকে এই নিয়ে খ্যাপায় তাকে, হাসিঠাভা করে। ভুলভাল খবর দিয়ে হয়রানি করিয়ে মজা দেখে। তবু চিয়াংয়ের চৈতন্য হয় না। মাঝিমাল্লা মহলে এখানে তাই ওর নাম হয়ে গেছে খ্যাপাটে চিয়াং।

–হ্যাঁ, মাঝিরা অনেকে দেখেছে যে মিকি যখন জাকার্তায় নৌকো ভাড়ার খোঁজখবর করছিল তখন এই চিয়াং ঘুরঘুর করছিল মিকির কাছাকাছি। মিকি ওকে চিনত না। ব্যাপারটা যে এতদূর গড়াবে ভাবেনি বন্দরের মাঝিরা। চিয়াংয়ের নিশ্চয় ধারণা হয়েছিল যে এই বিদেশি চুংয়ের গুপ্তধনের খোঁজ পেয়েছে। নইলে ওই সব অখাদ্য দ্বীপে কেউ ঘোরে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ভান মাত্র। হয়তো কেউ মজা করে চিয়াংয়ের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল। ধারণাটা।

চিয়াং ছুরি বের করেছিল শুনে মাঝিরা বেজায় চটে গেল। প্রচণ্ড বকাবকি করল চিয়াংকে। সবচেয়ে বেশি তড়পাল ফকির। সে চিয়াংকে কয়েক ঘা উত্তমমধ্যম না দিয়েই। ছাড়বে না। মামাবাবু অনেক কষ্টে ঠেকালেন ফকিরকে।

চিয়াং আধবোজা চোখে জুলজুল করে তাকিয়ে সব বকুনি-গালাগালি হজম করল। তারপর সহসা ফেটে পড়ল রাগে। চিনা ভাষায় উত্তেজিত স্বরে কী সব বলতে লাগল। মিকির সঙ্গে ওর এক প্রস্থ কথাবার্তা হয়। মাঝিরাও ওকে কিছু বলে।

–কী বলছে চিয়াং? মামাবাবু জানতে চাইলেন।

মিকি মুচকি হেসে যা বলে তার সারমর্ম এই–ও বলছে ওর ম্যাপটা চাই। জলদস্যু চুং নাকি ওর পূর্বপুরুষ। অতএব ওই ম্যাপে শুধু তারই অধিকার।

–কীসের ম্যাপ? মামাবাবু অবাক।

–গুপ্তধনের ম্যাপ। যে ম্যাপ দেখে আপনি হদিস পেয়েছেন কোন্ দ্বীপে, কীভাবে চুংয়ের গুপ্তধন লুকানো আছে।

–মানে বাস্তেন আইল্যান্ড?

–না। বাস্তেন আইল্যান্ডের ইতিহাস ও জানে। ও বলছে আগের দ্বীপটার কথা। যেখানে পাথরে খোদাই শিলালিপি পাওয়া গেছে। ওর ধারণা শিলালিপিটা আসলে সাংকেতিক ভাষা। যা উদ্ধার করলেই বোঝা যাবে গুপ্তধন ওই দ্বীপে কীভাবে লকানো আছে। ম্যাপে আর কী কী আছে ও জানতে চায়। তাই আপনার ব্যাগ ঘাঁটছিল মাম পেতে।

–যাচ্চলে। আচ্ছা পাগল! মামাবাবু বলেন, ওকে বুঝিয়ে দাও মিকি আমরা কোন গুপ্তধনের ম্যাপটাপ পাইনি। ওই শিলালিপি সংস্কৃত ভাষায় লেখা। সংস্কৃত প্রাচীন ভারতীয় ভাষা। গুপ্তধনের হদিস নিশ্চয় চিনা ভাষায় থাকবে।

মিকি চিয়াংয়ের সঙ্গে ফের কথাবার্তা চালায়। চিয়াংয়ের মুখে বাক্যের তুবড়ি ছোটে।

মিকি মামাবাবুকে বলে, আপনার কথা ও বিশ্বাস করছে না।

হতাশ মামাবাবু বলেন, তা আর কী করা যাবে? ও পাথরে খোদাই সংকেত উদ্ধার করুক। গুপ্তধন পাক। আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। তবে অমন কোনো ম্যাপ আমার কাছে নেই।

সুনন্দ ও আমি হাসছি শুনে। মাঝিরা ভ্যাবাচাকা। হামিদ কী জানি নির্দেশ দিতে অন্য দুই মাঝি বেরিয়ে গেল। মামাবাবু ভুরু কুচকে বলেন, আচ্ছা ও শিলালিপির ব্যাপারটা জানল কীভাবে?

মিকি ও হামিদ বলল, বোঝাই যাচ্ছে যে চিয়াং জাকার্তা থেকে আমাদের ফলো করে এসেছে। সব দ্বীপে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেছে আপনার কার্যকলাপ। আপনি বৈজ্ঞানিক। গাছপালা খুঁজছেন। এসব ওর মাথায় ঢোকেনি। এখানে অজানা দ্বীপে কেউ গেলেই চিয়াং ভাবে সে গুপ্তধন খুঁজছে। চুংয়ের গুপ্তধন।

–ও একা একা নৌকো বেয়ে এসেছে সাগরে? আমরা স্তম্ভিত।

–না একা নয়। ওর নিশ্চয় সঙ্গী মাঝি আছে। ওর নৌকো লুকানো আছে দ্বীপে কোথাও। সেই নৌকো খুঁজতে লোক পাঠিয়েছি।

বন্দিকে তাঁবুতে রেখে আমরা বাইরে আলোচনা করি, যে এখন এই লোকটাকে নিয়ে কী করা যায়? মামাবাবু বিব্রত।

মিকি ও হামিদ নিজেদের মধ্যে কী সব পরামর্শ করে। সুনন্দ ফকিরকে বলে, এক রাউন্ড চা খাওয়াও ভাই। বেড়ানো তো ভেস্তে গেল।

ফকির একটু অনিচ্ছায় চা বানাতে যায়। বোধহয় এমন জমাটি কাটার কোনো কিছুই বাদ দিতে চায় না।

খানিক পরে হামিদের সহচর দুই মাঝি ফিরে এসে জানায় যে চিয়াংয়ের নৌকো খুঁজে পেয়েছে তারা। এক সঙ্গী নিয়ে এসেছে চিয়াং। একটা খাঁড়ির মধ্যে নৌকোটা লুকানো ছিল। সঙ্গীটি সেখানে ছিল চিয়াংয়ের অপেক্ষায়। গুপ্তধনের ভাগ দেবে আশা দেখিয়ে তাকে জটিয়েছে চিয়াং। তবে সাগরে দুজনে নৌকো চালিয়ে আসা খুবই বিপজ্জনক।

অবশ্য গুপ্তধনের লোভে ওদের প্রাণের মায়াও তুচ্ছ। চিয়াংয়ের সঙ্গীকে শক্ত করে বেঁধে রেখে এসেছে। হামিদের মাঝিরা।

মামাবাবু মিকিকে বলেন, এই খ্যাপাটে লোকটাকে রেখে কী লাভ? ওদের বরং ছেড়ে দাও। জাভায় ফিরে যাক।

মিকি বলল, ও ব্যাটা এখন ফিরবে না মোটেই। আমাদের জ্বালাবে শুধু।

হামিদ জানায়, আমরা রাতে আর দিনের অনেকটা সময় ওই পাথরে খোদাই লেখা দ্বীপে মানে চিয়াংয়ের গুপ্তধনের দ্বীপে থাকায় ও এখনো তেমন গুপ্তধন খোঁজাখুঁজি করতে পারেনি। আমরা গেলেই পুরো দমে লাগবে।

–তা খুঁজুক। সুনন্দ মিচকে হেসে বলে, সারা জীবন খুঁজুক ওখানে।

হামিদ বলল, ভাবছি, আমরা শিলালিপি দ্বীপে ফেরার সময় চিয়াংদের নৌকোসুদ্ধ সঙ্গে নিয়ে যাব। অন্য কোনো দ্বীপে চলে যেতে বলব ওদের। কড়কে দেব যে ফের আমাদের চোখের সামনে এলে স্রেফ খুন করে ফেলব ওদের। তাহলে হয়তো ভয়ে এখন আর জ্বলাবে না আমাদের।

হামিদের প্রস্তাব মেনে নিলাম আমরা।

হামিদ বলল, আপাতত চিয়াংকে শাসিয়ে রাখি, তোমার ব্যবস্থা হচ্ছে। হাত পা বেধে সমদ্রে ফেলে দেব? না কোনো নির্জন দ্বীপে নির্বাসন দেব? দেখি ভেবে। ছুরি মারতে গিয়েছিলে এত বড় আস্পর্ধা! থাকুক ভয়ে ভয়ে।

আমি সুনন্দ কাছাকাছি একটু ঘোরাঘুরি করি। রোদ বাড়তে নিজেদের তাঁবুতে ঢুকলাম। মামাবাবু নিজের তাঁবুতে কী সব করছেন। বন্দি চিয়াংকে রাখা হয়েছে মিকিদের তাঁবুতে। ফকিরকে বলা হয়েছে যে বন্দি লোক্টা চাইলে জল খেতে দিতে।

মিকি গিয়ে মাঝিদের সঙ্গে গল্প জুড়ল। মাঝিরা একটা গুহার ভিতর রান্না করছে। মাঝিরা খেয়েদেয়ে ফিরে যাবে শিলালিপি দ্বীপে। তখন নিয়ে যাবে বন্দি চিয়াং আর তার সঙ্গীকে।

দুপুরের খাওয়া হল। আমার ও সুনন্দর তাঁবুতে ফোল্ডিং টেবিল ও টুল পেতে খাই সাধারণত। মামাবাবুও আসেন খেতে।

ফকির আমাদের খাবার সাজিয়ে দিয়ে বলল যে সে মাঝিদের কাছে যাচ্ছে খেতে। যাবার আগে ফকির ইতস্তত করে বলে, বন্দি চিয়াংকে কিছু খেতে দেব কি?

–হ্যাঁ দিও। মামাবাবু উদার, তবে সাবধান। ওর কোমরে দড়ি বেঁধে দড়ির অন্য প্রান্ত বেঁধে তবে ওর হাত-পায়ের বাঁধন খুলবে। হাতে একটা লাঠি নিয়ে তুমি পাহারায় থাকবে খাবার সময়। ওর খাওয়া শেষ হলে ফের হাত-পা বেঁধে দেবে।

ফকির চলে গেল ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে।

আমরা খাওয়া শেষ করার পর খাবার জল আনতে মাঝিদের কাছে গিয়ে দেখি তিন মাঝি ও মিকি খাচ্ছে। কিন্তু ফকির সেখানে নেই। সে নাকি আসেনি খেতে। লোকটা গেল কোথায়?

মিকির তাঁবুতে গিয়ে দেখি যে বন্দি চিয়াং উধাও। তবু ফাঁকা। ডাকাডাকি করেও ফকিরের কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। লক্ষ করলাম যে তাঁবুতে ফকিরের ব্যাগ দুটোও নেই।

একটা ঘোর সন্দেহ জাগে সবার মনে।

মাঝিরা ছুটল চিয়াংয়ের নৌকোর খোঁজে। তারা ফিরে এসে বলল যে নৌকো নেই। চিয়াংয়ের সঙ্গীটিও নেই। অর্থাৎ ওরা পালিয়েছে। ওরা দুজন বাঁধন খুলল কী করে? তবে কি?

মামাবাবু মৃদু হেসে বললেন, এতো দিব্যি বোঝা যাচ্ছে। শ্রীমান ফকির আসনে চিয়াংয়ের লোক। কৌশল করে ওকে আমাদের দলে ঢুকিয়ে দিয়েছিল চিয়াং। বাঃ চিয়াংয়ের বুদ্ধি আছে। আর ফকির লোকটার অ্যাকটিং দারুণ। কিসসুটি বুঝতে দেয়নি ওর মতলব। হয়তো ওর নাম ঠিকানা সবই ভুয়ো। আগের দ্বীপে ফকির বা চিয়াংই আমার ব্যাগ হাতড়েছিল। ম্যাপ খুঁজেছে। আমরা যে যে দ্বীপে গিয়েছি চিয়াং ফলো করে সেখানে গিয়ে লুকিয়ে থেকেছে। আমাদের গতিবিধির রিপোর্ট পেয়েছে ফকির মারফত। হয়তো আমাদের খাবারের ভাগও পেয়েছে। সুনন্দর গাছপাঁঠার কালিয়াও হয়তো চেখে দেখেছে চিয়াং। ওই জন্যেই ফকির মিকির ভক্ত সেজে পারতপক্ষে আমাদের চোখে আড়াল করত না। ভুতুড়ে বাস্তেন দ্বীপে অবধি থেকে গেছে। ফকিরই চিয়াংদের বাঁধন খুলে দিয়েছে, তারপর ওদের সঙ্গে পালিয়েছে দ্বীপ ছেড়ে।

আমি প্রশ্ন করি, চিয়াং এই দ্বীপে এল কখন? দিনের বেলা এলে নিশ্চয় আমাদের কারও চোখে পড়ত।

–এসেছে রাতে বা সন্ধের পর। মাঝিরা চলে যাবার পর। যারা গুপ্তধন খোঁজে তাদের ভূতের ভয় থাকলে চলে না। ফকির হয়তো আকাশে হাউই ছুঁড়ে সংকেত জানিয়েছে আসার জন্য। চিয়াং এখানে রাতে কোথাও লুকিয়ে থাকত আর দিনের বেলা আমাদের নজরে রাখত লুকিয়ে। আগের দ্বীপগুলোতেও তাই করেছে। হামিদ ওকে যা ভয়। দেখিয়েছে, আর থাকতে সাহস পায়নি। পাছে ফকিরের কীর্তি জেনে ফেলি তাই সেও আর রিস্ক নেয়নি।

যাগগে ভালোই হয়েছে। আপদ বিদায় হয়েছে। থাকলেই আমাদের বিপদ বাড়ত।

কিন্তু ওরা না থাকলেও আমাদের বিপদ যে কতদূর গড়িয়েছে তা টের পাওয়া যায়। খানিক বাদে।

হামিদের এক মাঝি এসে উদ্বিগ্ন স্বরে জানাল যে তাদের নৌকোর দাঁড়গুলো নেই। একটাও নেই। চুরি গেছে। আর পালের দড়িগুলো অনেক জায়গায় কাটা। তবে পালের কাপড় কাটেনি। চিয়াংদের কীর্তি সন্দেহ নেই।

শুনে মাঝিদের মাথায় হাত। এই দ্বীপ ছেড়ে এখন যাবে কেমন করে? হামিদ গর্জে ওঠে, এবার ও ব্যাটাদের হাতে পেলে সত্যি খুন করব।

বোঝা গেল যে পাছে হামিদরা ওদের পিছু নিয়ে ধরে ফ্যালে সেই ভয়ে চিয়াং-হামিদের নৌকোটা অকেজো করে গেছে।

ব্যাপার শুনেই মামাবাবু দূরবিন নিয়ে উঠলেন একটা উঁচু জায়গায়। সমুদ্রের নানা দিকে দেখতে দেখতে বললেন, হু একটা নৌকো দেখছি অনেক দূরে। তিনটে মাথা দেখছি নৌকোয়। সাঁতরে বোধহয় ধরা যাবে না আর।

আমি ফুট কাটি, সুনন্দ ঠিক পারবে। ও কলেজ লাইফে সুইমিং চ্যাম্পিয়ান ছিল। সুনন্দ ট্রাই কর।

সুনন্দ অগ্নিদৃষ্টি হেনে জবাব দেয়, সরি এটা সমুদ্র। সুইমিংপুল নয়।

মামাবাবু দেখতে দেখতে বলেন, ওরা কিন্তু শিলালিপি দ্বীপ মানে যেখানে গুপ্তধন আছে মনে করছে সেদিকে যাচ্ছে না। হয়তো ভয় পেয়েছে, হামিদ মাঝিরা কোনোরকমে যদি ওই দ্বীপে হাজির হয় তাহলে রক্ষে নেই ওদের। তবে আমরা সবাই জাভায় ফিরে গেলে চিয়াং ঠিক ওই দ্বীপে ফের আসবে গুপ্তধন খুঁজতে।

মামাবাবু তার তাঁবুতে ঢুকে একটা ব্যাগ খুলেই চমকে বললেন, দ্যাখো কাণ্ড। আমার এই ব্যাগ কেউ হাতড়েছে। কাগজপত্র সরিয়েছে। নির্ঘাৎ চিয়াং বা ফকিরের কীর্তি। আমরা যখন খাচ্ছিলাম তোমাদের টেন্টে তখন নিশ্চয় সরিয়েছে। টাকাকড়ি কিন্তু খোয়া যায়নি।

ব্যাগের কাগজপত্রর হিসেব মেলাতে মেলাতে মামাবাবু বললেন, গ্যাছে একটা এই বছরের বাংলা পাঁজি। শিলালিপি দ্বীপের একটা স্কেচ করেছিলাম সেটা। একটা মিনি সাইজের সংস্কৃত এবং পাশে বাংলায় লেখা শ্রীভাগবত গীতা। একটা জুলজির পেপার আধখানা লিখেছিলাম, তাতে কিছু হাতে আঁকা ছবি ছিল, সেটাও নেই। বুঝে ব্যাপার? ম্যাপ ভেবে নিয়ে গেছে। যদি কোনোটা কাজে লাগে? ইস পাঁজিটা রেঙ্গুনের এক বাঙালি

ভদ্রলোকের মায়ের জন্যে এনেছিলাম। অনুরোধ করেছিলেন আনতে। ফেরার পথে দিতাম। গেল। দেশে ফিরে বাইপোস্ট পাঠাতে হবে আর একখানা পাঁজি কিনে।

মাঝিদের সঙ্গে হাতুড়ি-করাত-কাটারি জাতীয় কিছু যন্ত্রপাতি আছে। তাই দিয়ে মোটামুটি কাজ চালানোর মতো দাঁড় তারা তৈরি করে নিতে পারত। কিন্তু সেই সব হাতিয়ার তো রয়েছে শিলালিপি দ্বীপে। আমাদের কাছেও হাতুড়ি-পেরেক-কাটারি ইত্যাদি কিছু যন্ত্রপাতি আছে বটে। তবে সেগুলো ছোট মাপের। নিরুপায় মাঝিরা তাই দিয়েই লেগে গেল কাঠ জোগাড় করে দাঁড় বানাতে। অন্তত কাজ চালানোর মতো। কিছুটা পথ যাবার মতো। পালের কাটা দড়ি জোড়া দেবার কাজও চলে। কিন্তু দেরি হয়ে গেল। অন্ধকার নামার আগে তাদের কাজ শেষ হয় না। এমন আধাখেঁচড়া পাল ও দাঁড় নিয়ে রাতে সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া রীতিমতো বিপজ্জনক। সুতরাং সে রাতটা মাঝিরা বাস্তেন দ্বীপে কাটাতে বাধ্য হল।

হামিদ আর তার দুই সঙ্গী মাঝির যে কী ভীষণ ভূতের ভয় টের পেলাম সেদিন। গোটা রাত তারা গুহার মধ্যে আগুন জ্বেলে জেগে কাটাল। চিৎকার করে কী জানি বলছিল দেশি ভাষায়। মিকি জানাল, ওগুলো ভূত তাড়াবার মন্ত্র।

ভোরবেলা দেখি একটা পুরোনো দাঁড় পড়ে আছে বেলাভূমিতে। অর্থাৎ দাঁড়গুলো চিয়াং সমুদ্রে ফেলে দিয়েছিল। তারই একটা ভেসে ফিরে এসেছে। কিছুটা সুবিধা হল দাঁড়টা পেয়ে।

হেডমাঝি হামিদ চিন্তিতভাবে জানাল মামাবাবুকে, আপনাদের নিয়ে জাকার্তায় ফেরা সমস্যা হবে। মানে এই অবস্থায়। আপনাদের প্রচুর লটবহর। লোকও বাড়বে। এমনি জোড়াতালি দেওয়া দাঁড় আর পাল নিয়ে টাল সামলানো মুশকিল হবে। জোর বাতাস বইলে নৌকো ডুববে। আমরা নিজেরা যাহোক করে জাকার্তায় ফিরে যাব। সামলে নেব নৌকো। জলে ছিটকে পড়লেও উঠে পড়ব নৌকোয়। আপনারা পারবেন না।

–কী ভাবছ তুমি? মামাবাবু জানতে চান।

–আমি ভাবছি। হামিদ ইতস্তত করে।

মামাবাবু বলেন, একটা কাজ করতে পারো। তোমরা আপাতত চলে যাও জাকার্তায়। ওখানে গিয়ে পাল আর দাঁড় ঠিকঠাক করে আবার চলে আসবে এই দ্বীপে। আমরা এখানে থেকে যাব ততদিন। তাড়াতাড়ি যেতে-আসতে কতদিন লাগবে তোমাদের?

–অন্তত চার-পাঁচ দিন।

–ভেরিগুড। আমার এই দ্বীপে আরও কদিন থাকা দরকার। আমাদের নিয়ে ভেবো না। রসদ দরকার মতো সবই মজুত আছে। চার-পাঁচ দিন দিব্যি চলে যাবে।

মদ যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। বুঝি এই প্রস্তাবটাই সে দিতে যাচ্ছিল।

–মিকির কী ইচ্ছে? মামাবাবুর প্রশ্ন।

মিকি বলল, আপনারা থাকলে আমিও থাকব।

-বেশ বেশ। মামাবাবু খুশি।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে হামিদ তার দুই সহচর নিয়ে নৌকো ভাসাল সাগরে।

হামদরা চলে যেতে মামাবাবুর মেজাজ যেন ভারি শরিফ হয়ে গেল। আমাদের বললেন, চলো হে সবাই আজ সকালে একবার দ্বীপটা চক্কর দিয়ে আসি। দেখি ফন বাস্তেন কেমন বোটানিকাল গার্ডেন বানিয়েছিল।

সত্যি কতরকম অভিনব গাছগাছালি যে ছড়িয়ে আছে দ্বীপটায় যা এমন দ্বীপে একসম থাকা অসম্ভব। যদি না কেউ বাইরে থেকে এনে লাগায়। কিছু উদ্ভিদের উল্লেখ আগে করেছি আরও কিছু উল্লেখযোগ্য গাছের কথা জানাচ্ছি। সব এখন মনে নেই। কিছু উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদ হয়তো আমাদের চোখ এড়িয়ে গেছে। দেখেছি যে স্থানীয় দেশি জংলা অতি সাধারণ গাছগাছড়া ঝোঁপঝাড়ের সঙ্গে মিশে আছে অনেক বিশিষ্ট গাছপালা। যেগুলি অবশ্যই বাস্তেনের আমদানি নানা দেশ থেকে।

গোটা দুই বাস্কেটবল কোর্টের আয়তন সমান মোটামুটি সমতল একখণ্ড জমিতে অনেকগুলো বড় গাছ মাথা তুলে রয়েছে এক জায়গায়। শন শন শব্দ হচ্ছে পাতার ফাঁক দিয়ে হাওয়া বইতে। মামাবাবু গাছগুলো দেখিয়ে বললেন, দেখেচ ঝাউগাছ। মিকি তোমরা কী বলো ঝাউকে?

–আরু। জবাব দেয় মিকি।

–আর ঝাউয়ের ফাঁকে ফাঁকে ছোট গাছগুলো কী?

আমি ও সুনন্দ মাথা চুলকোই। মিকি মিটিমিটি হাসে।

–মিকি তুমি চেনো? প্রশ্ন মামাবাবুর।

–হাঁ স্যার রবার গাছ।

ইস রবার গাছ দেখেছি আগে। মনে পড়ল না এখন। ভারি আপশোস হয় আমার।

দুদিন ধরে ঘুরে ঘুরে চোখে পড়েছে–ডুমুর গাছ, সয়াবিন লতা, সুপারি গাছ, তামাক পাতার গাছ, নয়নতারার ঝোঁপ। বাঁশ ঝাড়। জল জমা নিচু জায়গায় লম্বা লম্বা বেত গাছ।

যত্রতত্র আনারস গাছ। দিব্যি বড় বড় আনারস ফলে রয়েছে। আম কাঁঠাল তেঁতুল গাছ দেখেছি প্রচুর। ছোট ছোট জুই ফুলের ঝাড়। সুগন্ধে ম ম করছে চারপাশ। সমুদ্র তীরে লম্বা লম্বা নারকেল গাছ অবশ্য এখানকার দ্বীপগুলিতে অতি পরিচিত দৃশ্য। প্রবল সমুদ্রের হাওয়ায় নারকেলের পাতাগুলি সদাই দুলছে।

বড়গাছের নিচে ছায়ায় একটা ফুল দেখে আমরা থ। মাটি থেকে একটু উঁচুতে গোড়ার ওপর পাঁচটি প্রকাণ্ড মোটামোটা পাপড়ি গোল হয়ে মাটির প্রায় সমান্তরালভাবে ছড়িয়ে আছে। পাপড়িগুলো মিলেছে যেখানে সেখানটা মস্ত গোল ডাব্বার মতো। সেটা বোঁটা বা কাণ্ড হবে। ফুলটার ব্যাস অন্তত আড়াই-তিনফুট। পাপড়িগুলো মেটে রঙের। বাক অংশের রংও প্রায় তাই। বাপরে এ কী ফুল! শুধুই ফুল। উদ্ভিদের আর কোনো ডালপালা যে দেখছি না।

মামাবাবু খুঁটিয়ে দেখে বললেন, জানো এটা কী ফুল?

আমরা মাথা নাড়ি–না।

আমি বুঝেছি। ছবি দেখেছি এই ফুলের। র‍্যাফলসিয়া আরনলদি। বিশ্বের বৃহত্তম ফুল। এর পাতা নেই। পাতার মতো দেখতে অংশগুলো আসলে শিকড় বা কাণ্ড। শুধুমাত্র সুমাত্রার জঙ্গলে এই ফুল পাওয়া যায়। মিকি তুমি এই ফুল দেখেছ আগে?

–না। মিকি ঘাড় নাড়ে। বলে, তবে শুনেছি এর কথা।

মামাবাবু বললেন, এই ফুলের গাছ আসলে প্যারাসাইট। অর্থাৎ পরজীবী। এর কাণ্ড থেকে সরু সুতোর মতন শিকড় বেরোয়। ওই শিকড়গুলি অন্য গাছের গায়ে ঢুকিয়ে দিয়ে সেই গাছের রস নিজের খাদ্য হিসেবে টেনে নিয়ে এরা বাঁচে। সত্যি বাস্তেন আশ্চর্য উদ্ভিদপ্রেমী ছিল। এ ফুলের গাছ জোগাড় করা সহজ ব্যাপার নয়।

দ্বীপটায় নানান ফল-ফুলের গাছ জন্মানোয় প্রচুর পাখি এসে জুটেছে। প্রজাপতি উড়ছে রং-বেরঙের। কাঠবেড়ালিও চোখে পড়ল। ঝোঁপঝাড়ের ভিতর সড়সড় আওয়াজ জানান দেয় আরও কিছু ছোট জীবের চলাফেরা। তবে বিষাক্ত সাপের ভয়ে আমরা সতর্ক থাকি। লাঠি বাগিয়ে। ঘন ঝোঁপের মধ্যে যাই না। কানে আসে পাখির কলকাকলি ও মধুর শিস।

মামাবাবু যেতে যেতে মন্তব্য করেন, বাস্তেন আইল্যান্ড ভুতুড়ে থাকাই মঙ্গল।

–কেন? আমি অবাক।

–কারণ তা নইলে মানুষ এখানে এসে বসতি করবে। ঘরবাড়ি বানাবে। গাছ কাটবে। এখানকার জীবজন্তুদের মারবে বা তাড়িয়ে ছাড়বে। বাস্তেনের গড়া সাধের দ্বীপ ধ্বংস করবে। দুঃখের কথা কী জানো, মানুষ ভাবে যে এই পৃথিবীটা বুঝি শুধু তাদেরই জন্যে।

অন্য জীবজন্তুর অধিকার নেই এখানে। মানুষ নিজের স্বার্থে কত যে গাছপালা ধ্বংস করেছে, কত জীবজন্তুকে নিঃশেষ করে দিয়েছে পৃথিবী থেকে।

–মিকি তুমি ফিরে গিয়ে লোককে বলবে, বাস্তেন দ্বীপটায় সত্যি সত্যি ভুতুড়ে। দিনের বেলা তবু কাটানো যায় কিন্তু রাতে ভয়ংকর। বিকট সব আওয়াজ হয়। অশরীরী ছায়ামূর্তি ঘুর বেড়ায়। রাতে তাঁবুর বাইরে দুমদাম্ ঢিল পাথর পড়ত। বাস্তেন সাহেবের প্রেতাত্মার ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা যেত। শাসাত, দ্বীপ ছেড়ে চেলে যাও নইলে বিপদে পড়বে ভীষণ। মাঝে মাঝে রাতে ঝোড়ো দীর্ঘশ্বাসের মতো গা-হিম করা আওয়াজ করে হাওয়া বয় দ্বীপে। বৃষ্টিঝরা রাতে কান্নার আওয়াজ গুমরে গুমরে ওঠে। ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। হামিদরা তো বাস্তেন দ্বীপে কিছুতেই থাকেনি রাতে। নেহাতই ইন্ডিয়ান প্রফেসর ভূত ঠেকাবার মন্ত্র জানত তাই রক্ষে পেয়েছি এ-যাত্রা।

–হ্যাঁ আর একটা ভয় যোগ করতে পারো। বলবে, দ্বীপটায় কিং-কোবরা আছে। তমি। দেখেছ সচক্ষে। তাতেই অর্ধেক কাজ হাসিল হবে। কেউ এই দ্বীপে থাকতে চাইবে না। পা দিতেই চাইবে না অনেকে শঙ্খচূড়ের ভয়ে। নিশ্চিন্তে শ্রীবৃদ্ধি পাবে বাস্তেনের বোটানিকাল গার্ডেন। এই দ্বীপে কী কী গাছ আছে বলবে না কাউকে।

মিকি ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানায় মামাবাবুর কথায়।

ফেরার পথে আমরা বাস্তেনের পোড় ভিটে হয়ে আসি। ছড়িয়ে থাকা ভাঙাচোরা নিসগুলো মামাবাবুরা ঘুরে ঘুরে দেখেন। কিছু জিনিস হাতে নিয়ে পরীক্ষা করেন।

সেদিন দুপুরে তিনি একা বেরিয়ে গেলেন ছাতা মাথায়। বুঝলাম কোনো কারণে আমাদের সঙ্গে নেবার ইচ্ছে নেই। আমি সুনন্দ ঘুম মারলাম দুপুরে। পরদিন সকালেও মামাবাবু একা বেরুলেন। আমাদের ডাকলেন না। বললেন, আমি ঝরনাটার ধারে কাছে ঘুরব। তোমরা অন্য দিকে যাও।

আমি ও সুনন্দ শুধু দুজনে ঘুরলে জমে বেশি। বেড়ানো আড্ডা দুই হয়। মামাবাবু সঙ্গে থাকলে কিঞ্চিৎ আড়ষ্ট থাকি। যদিও শিখতে পারি অনেক কিছু।

ঘুরতে ঘুরতে সুনন্দ আশঙ্কা প্রকাশ করে, হামিদরা ঠিকঠাক ফিরবে তো?

–জরুর ফিরবে। পাওনা বাকি। আমি নিশ্চিত।

–না। মানে যদি জাকার্তায় পৌঁছতে না পারে ঠিকমতো? নৌকোর যা অবস্থা ছিল।

–তা বটে। আমি সায় দিই।

–আমাদের খাবারের স্টকে আরও চার-পাঁচ দিন চলে যাবে। তারপর?

–কী আর হবে? ডুমুর সিদ্ধ, কাঁঠাল, এঁচোড় সিদ্ধ। সিদ্ধ মাছ। ডিম সিদ্ধ।–এই সব খেয়ে কাটাব। আমি নির্বিকার।

–আটকে গেলে এ দ্বীপ থেকে কবে যে উদ্ধার পাব? এ দিকে নৌকো জাহাজ চলে খুব কম। চিন্তিত সুনন্দ বিড়বিড় করে।

সেদিন দুপুরে খাওয়ার পর মামাবাবু নিজের তাঁবুতে কাটালেন কী সব করে। আমি ও সুনন্দ সমুদ্রের বেলাভূমিতে আড্ডা মেরে কাটালাম বিকেলটা।

মিকি একটা বন্য ছাগল শিকার করেছিল। রাতের খাবার সুনন্দ রাঁধল মাংসের পোলাও। দারুণ। মামাবাবু অবধি চেটেপুটে খেলেন। খাবার পর মামাবাবু আমাকে ও সুনন্দকে বললেন, কাল সকালে টিফিনের পর আমার তাঁবুতে চলে এসো। দরকারি কথা আছে।

কী কথা? প্রচণ্ড কৌতূহল হয়। মামাবাবু যে শুধুমাত্র বাস্তেন দ্বীপে গাছপালার সংগ্রহ দেখতে এত দূরে, এত খরচ করে আসেননি তা আন্দাজ করেছিলাম প্রথম থেকে। অন্য কোনো গূঢ় কারণ। এবার কি তার হদিস পাব?

সে রাতে টানা বৃষ্টি হল ঘণ্টা দুই। শনশন হাওয়া বয়। উথালপাথাল ঢেউয়ের শব্দ। এমন রাতে এমনি নিরালা দ্বীপে কেমন গা ছমছম করে।

পরদিন সকালে আকাশ দিব্যি পরিষ্কার। আমি ও সুনন্দ মামাবাবুর তাঁবুতে গিয়ে জটলাম। মিকি চা দিয়ে গেল। মামাবাবুর সামনে বসি। গরম চায়ে চুমুক দিয়ে মামাবাবু ধীর কণ্ঠে শুরু করলেন বলতে, আচ্ছা এই যে আমি এত দূরে দ্বীপটায়, এত সময় কাটাচ্ছি কেন, তাই নিয়ে তোমাদের মনে কি কোনো প্রশ্ন জেগেছে?

আমি চুপ। সুনন্দ ফস্ করে বলে বসে, আমি বুঝেচি।

–কী বুঝেচ? মামাবাবু যেন রীতিমতো বিস্মিত।

–ফন বাস্তেন বোটানিকাল গার্ডেন তৈরির ভান করে আসলে আফিম তৈরি করত কিনা, তাই জানতে। কলকাতায় আপনার বাগানে পোস্ত গাছ দেখে মিকি যেই বলল এই দ্বীপে ওই গাছ সে দেখেছে অমনি তারপর থেকে আপনি খুব তো ইন্টারেস্টেড হয়ে পড়লেন কেসটা নিয়ে।

–ঘোড়ার ডিম বুঝেচ। মামাবাবু তর্জন করেন, বাস্তেন আফিম বিক্রি করলে লোকে ঠিক জেনে ফেলত। তার সে বদনাম নেই। প্রমাণ পেয়েছি যে সে জাভায় এসে বিক্রি করত তার শিল্পকর্ম এবং খুব সম্ভবত আরও একটি জিনিস।

যাকগে আমি তাই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। আমার এখানে আসা ও দেখার উদ্দেশ্য ছিল অন্য। বাস্তেনের লাগানো পোস্ত গাছের ঝাড় কেন অত বড় বড়? কেনই বা এখানে ক্যালিফোর্নিয়ান পপির পাতা এত বড় বড় আর মোটা হয়েছে? যে কারণ আমি কলকাতায় বসে সন্দেহ করেছিলাম তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সংগ্রহই আমার এখানে আসার আসল উদ্দেশ্য। বাস্তেনের বিচিত্র বোটানিকাল গার্ডেন দেখাটা বাড়তি লাভ।

আমরা উভয়েই বাক্যহারা।

একটু দম নিয়ে মামাবাবু বলেন, কলকাতায় আমি যে ইদানীং বাগান করা নিয়ে মেতেছি তা কিন্তু স্রেফ ফুল ফোঁটানো নয়। পাতাবাহার বা ক্যাকটাসের একজিবিশন করা নয়। পাড়ার ঘোষবাবুদের মতো চন্দ্রমল্লিকা গোলাপ ইত্যাদি ফুটিয়ে পাড়ার লোককে দেখিয়ে ক্রেডিট নেওয়া নয়। আমার বাগান করা শৌখিন উদ্যানচর্চা নয়। এর উদ্দেশ্য আলাদা।

আমরা উদগ্রীব হয়ে শুনি।

মামাবাবু বলেন, জিওবোটানি বিষয়টা কী জানো? মানে জিওলজি এবং বোটানির মিশ্রণ। বাংলায় বললে, ভূ-উদ্ভিদ বিদ্যা।

–নামটা শুনেছি। সুনন্দ ইতস্তত করে বলে।–উদ্ভিদ আর ভূ-বিদ্যা মানে জিওলজির সম্পর্ক নিয়ে রিসার্চ।

–কী ধরনের রিসার্চ? মামাবাবুর প্রশ্ন।

–তা ঠিক জানি না। সুনন্দ তোতলায়।–নামটা পড়েছি একটা জার্নালে। আর্টিকেলটা পড়ার সময় পাইনি।

–পড়া উচিত ছিল। নতুন বিষয় দেখলেই পড়বে। যাকগে, বুঝছি তোমরা কিসু জানো না এ বিষয়ে। দু-চার কথায় সহজ করে ব্যাখ্যা করি ব্যাপারটা। এই নিয়ে গবেষণার কারণেই আমার এখানে আসা।

–তোমরা হয়তো জানো যে পরজীবী বাদে অন্য গাছগাছড়া–বড় গাছ, ছোট গাছ, ঘাস ঝোঁপঝাড় সবাই মাটিতে শিকড় ঢুকিয়ে তার বাঁচার প্রয়োজনে জমি থেকে খাদ্য আর জল টেনে নেয়। মাটি বা জমিতে অনেক কিছু মিশে থাকে। ধাতু বা খনিজপদার্থও থাকে নানারকম। কোনোটা বেশি,কোনোটা কম। গাছের শিকড় মাটি থেকে সব কিছু নেয় তার দেহে। তার কাণ্ডে ও শাখা-প্রশাখায়। এই ভাবে নানা ধাতু ঢোকে উদ্ভিদ দেহে। এর ফলাফল হয় নানারকম। হয়তো কোনো ধাতু কোনো উদ্ভিদের পক্ষে উপকারী। গাছের খাদ্যে সেই ধাতু বেশি থাকলে ওই উদ্ভিদের বাড় বেশি হয়, ফল ফুল বেশি হয়। আবার একই উদ্ভিদের পক্ষে অন্য। কোনো ধাতু হয়তো ক্ষতিকর। সেই ধাতু খাদ্যের সঙ্গে বেশি পরিমাণে ওই উদ্ভিদের শরীরে ঢুকলে গাছের বাড় কম হয়। পাতা বা ফুলও কম হয়। পাতা ও ফুলের রং ও আকার বদলে যায়। বদলে যায় উদ্ভিদটির গড়ন। কখনো কখনো

জমিতে ওই খনিজ দ্রব্য বেশি পরিমাণে থাকলে সেখানে ওই গাছের বীজ থেকে অঙ্কুরই জন্মাতে চায় না। আবার একই ধাতু অন্য এক উদ্ভিদ দেহে কোনো প্রভাবই ফেলতে পারে না। কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি–

বেসিয়াম অবোভেটাম-এর একটি প্রজাতির সাহায্যে আফ্রিকা মহাদেশে জিম্বাবোয়ে রাজ্যে খনিজ তামা আবিষ্কার করা গেছে। এ একরকম জংলা ছোট গাছ। সূর্যমুখী ধরনের ফুল পাতা। এক গ্রাম মাটিতে অন্তত পঁচিশ মিলিগ্রাম তামা না থাকলে সেই মাটিতে এই গাছের বীজ থেকে অঙ্কুরোদগম হয় না। তাই এই প্রজাতির গাছ বা ঝোঁপ যেখানে বেশি ঘন দেখা যায়, জিওলজিস্টরা সেখানকার মাটি খুঁড়ে স্যাম্পল নিয়ে, সেখানকার পাথর নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেন তামা আছে কি না এবং থাকলে পরিমাণে কেমন? বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাদের ধারণা সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। অর্থাৎ সেখানে মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণে তামা মিলেছে।

আবার বেসিয়াম অবোভেটামের আর এক প্রজাতি আফ্রিকায় কঙ্গো রাজ্যে এবং কাছাকাছি অঞ্চলের জমিতে যথেষ্ট পরিমাণে তামা থাকার লক্ষণ জানান দেয়।

–হিউমেনিয়া কাঙ্গানিস এবং হিউমেনিয়া রবার্টি প্রজাতির উদ্ভিদ আফ্রিকার জাইরে রাজ্যে তামা আবিষ্কারের এক প্রধান সূত্র বলা যায়। এরা স্থানীয় জংলা ছোট গাছ। জাইরেতে বহু আগে অনেক তামার খনি ছিল। কিন্তু নানা কারণে খনিগুলিতে তামা তোলা বন্ধ হয়ে যায়। খনিগুলি পরিত্যক্ত হয়। খনি ঘিরে ঘরবাড়ি বসতির চিহ্ন লোপ পায় কালে কালে।

কিন্তু ওইসব খনি এলাকার জমিতে প্রচুর পরিমাণে তামা থাকার ফলে পরিত্যক্ত বুজে যাওয়া খনিগুলির ওপর এবং কাছাকাছি জায়গায় ওই দুরকম উদ্ভিদের ঘন ঝোঁপ গজিয়ে ওঠে। পরে এখন ভূ-উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা জাইরেতে ওই দুরকম গাছের ঘন ঝোঁপ দেখলেই মাটি খুঁড়ে দেখেছেন সেখানে খনিজ তামা আছে কি না? পেয়েও গেছেন এইভাবে কয়েকটি পরিত্যক্ত তামাসমৃদ্ধ খনির হদিস। যে খনিগুলিতে এখনো যথেষ্ট পরিমাণে তামার আকর রয়েছে।

চায়ে চুমুক দিয়ে একটু থেমে মামাবাবু বললেন, আমি গাছপালা উদ্ভিদগুলোর– বৈজ্ঞানিক নাম করছি। এদের স্থানীয় নাম জানি না। কিছু জেনেছিলাম, ভুলে গেছি। শুধু ভারতব কিছু মিনারেল ইন্ডিকেটর প্ল্যান্টের দেশি নাম মনে আছে। তোমাদের আগ্রহ থাকলে দেশি বিদেশি মিনারেল-ইন্ডিকেটর প্ল্যান্টের স্থানীয় নাম খুঁজে পেতে জেনে নিও।

–হ্যাঁ, আরও কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি। যেমন আরমেরিয়া ভালগারিস। প্রধানত শীতের দেশের গাছ+ছোট ঝোঁপ। জংলি বলা যায়। জমিতে যথেষ্ট পরিমাণ খনিজ তামা থাকলে এই উদ্ভিদের বাড় বেশি হয়, প্রচুর জন্মায় ঘন হয়ে। ওয়েলস-এ এই উদ্ভিদের বাড় ও ঘন ঝোঁপ লক্ষ করে বিজ্ঞানীরা কয়েক জায়গায় খনিজ তামাসমৃদ্ধ জলাভূমি আবিষ্কার করেছেন। মজার কথা কী জানো। হাইড্রানজিয়া ম্যাক্রোফাইল্লা নামে এক উদ্ভিদ-প্রজাতি যেখানে জন্মায় সেই জমিতে প্রচুর পরিমাণে খনিজ অ্যালুমিনিয়াম থাকলে এই গাছের ফলের রং হয় নীলচে। কিন্তু জমিতে অ্যালুমিনিয়াম না থাকলে কিংবা খুব সামান্য

পরিমাণে থাকলে এর ফুলের রং হয় গোলাপি। সুতরাং ফুলের রং দেখে ধরা যায়, ওই গাছ যেখানে জন্মেছে সেই জমিতে খনিজ অ্যালুমিনিয়াম বেশি আছে কি না?

মামাবাবু ঝপ করে চুপ মেরে গেলেন। তারপর বললেন, নাঃ বড় বকছি। তোমাদের বোর করছি।

–না না বলুন। দারুণ ইন্টারেস্টিং লাগছে। আমি ও সুনন্দ সরবে জানাই।

মামাবাবু খুশি মুখে বললেন, বেশ, তবে আরও কয়েকটা উদাহরণ দিই। এই ধরো যে মাটিতে বেশি পরিমাণে জিংক অর্থাৎ দস্তা আছে সেখানে ভায়োলেট ফুলের গাছ খুব তেজি হয়, প্রচর হয়। জমিতে বেশি পরিমাণে দস্তা থাকলে ভায়োলেট ফুলের গাছের পাতা সবজের বদলে হলদে হয়ে যায়। ইউরোপে বেলজিয়াম এবং আরও কয়েকটি দেশে। ভায়োলেট গাছের পাতার রং লক্ষ করে সেখানে দস্তার খনি আবিষ্কার হয়েছে।

-জিপসাম-এরও ইন্ডিকেটর প্ল্যান্ট আছে। রাজস্থানে দেখা গেছে ক্যালোট্রোপস প্রোসেরা, আর পারসিকা এবং আর সিউডো-টোমেন্টোসা–এই তিন প্রজাতির গাছ এক জায়গায় প্রচুর জন্মালে সেখানকার মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণ জিপসাম আছে ধরা যায়। এই গাছগুলি জংলা টাইপের। সরু চার-পাঁচ ফুট লম্বা, গাঁটে গাঁটে দুটি একটি পাতা থাকে।

–জানো কি, তামিলনাড়ুর সমুদ্রতটের বালিতে কোথাও কোথাও তেজস্ক্রিয় ধাতুর সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রধানত সেরিয়াম এবং থোরিয়াম। ওই বালুময় জমিতে ক্যাথারেস রোসেয়াস, যার আর এক নাম মাগাস্কার পেরিউইংকিল জন্মালে গাছের গঠনে বিশেষ কিছু বিকৃতি লক্ষ করা গেছে। বৈজ্ঞানিক নামগুলো শুনে ঘাবড়িও না হে, এই গাছটির ফুলকে আমরা সাদা বাংলায় বলি নয়নতারা।

–জমিতে বা জমির নিচে শিলাস্তরে বেশি পরিমাণ তেজস্ক্রিয় ধাতু থাকলে ওই জমিতে জন্মানো অনেক উদ্ভিদের গড়ন বিকৃত হয়। উদ্ভিদের বাড় নষ্ট হয়, ফুল পাতার স্বাভাবিক রং বদলে যায়। এই যেমন কানাডায় গ্রেট বিয়ার হ্রদের কাছে জলাভূমিতে মাটির নিচে ইউরেনিয়াম আবিষ্কার হয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে। ওই জলাভূমিতে পানিফলের মতো একরকম ফল জন্মায়। যে গাছের বৈজ্ঞানিক নাম এপিলোবিয়াম অগাস্টিফোলিয়াম। জলার মাটির তলায় প্রচুর ইউরেনিয়াম থাকার ফলে পানিফল জাতীয় ওই জলার গাছের ফুলের রং সবজের বদলে হয় সাদাটে।

মাটিতে বা মাটির তলায় শিলাস্তরে বেশি ইউরেনিয়াম থাকলে সেই জমিতে জন্মানো ছোট ঝোঁপঝাড়ের বাড় খুব কম হয়। এই সব জংলা ঝোঁপ সাধারণত মাটি থেকে খাদ্যের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পদার্থ সেলেনিয়াম শোষণ করে। ফলে তাদের ডালপালা পাতা বিষাক্ত হয়ে যায়। গোরু ছাগল ইত্যাদি গবাদি পশু ওই সব গাছের ডাল-পাতা খেলে। অসুস্থ হয়ে পড়ে। যেহেতু সেলেনিয়াম ইউরেনিয়ামের সঙ্গে প্রায়ই, এক জায়গায় মিশে থাকে, এমনি বিষাক্ত ঝোঁপঝাড় নজরে এলে ভূ-উদ্ভিদ-বিদ্যা

বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি সেখানের মাটিতে বা মাটির তলায় সেলেনিয়াম এবং তার সঙ্গে ইউরেনিয়াম থাকতে পারে বলে। আন্দাজ করে। মাটি খুঁড়ে খোঁজে। উত্তর আমেরিকায় এই লক্ষণ বিচার করে কয়েকটা ইউরেনিয়ামের খনি আবিষ্কারও হয়েছে।

–কখনো কখনো দেখা গেছে, ঘন জঙ্গলে বা প্রচুর গাছপালার মধ্যে হঠাৎ একখণ্ড অনুর্বর প্রায় ন্যাড়া উদ্ভিদহীন ভূখণ্ড। এই দৃশ্য দেখলে ভূ-উদ্ভিদ বিজ্ঞানী তখুনি সেখানের জমিতে এবং জমির নিচে যথেষ্ট পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পদার্থ থাকার সম্ভাবনা আশা করেন। ইউ. এস. এ. তে এই লক্ষণ বিচার করে আবিষ্কার হয়েছে কয়েকটি থোরিয়ামের আকর। আরও কিছু কিছু ইন্টারেস্টিং কেসের কথা মনে পড়ছে। কিন্তু গলাটা যে ধরে গেছে বকে বকে। বাবা সুনন্দ এক রাউন্ড চা খাওয়াও তো। মিকিকে ডাকার দরকার নেই। আমার তাঁবুতে স্টোভ, চা পাতা, চিনি কাপ–সব মজুদ আছে।

গরম চায়ে চমক দিতে দিতে মামাবাবু ফের শুরু করেন–জানো, কোথাও মাটিতে বা মাটির নিচে শিলাস্তরে যথেষ্ট পরিমাণ সোনা রূপা এমনকি হিরের ভাণ্ডার আছে কি না সেখানে জন্মানো কিছু গাছগাছড়ার বিশেষ বিশেষ লক্ষণ দেখে জিওবটানিস্টরা এখন আন্দাজ করতে পারেন মোটামুটি। যেমন ডেলোজিয়া ক্যানডিডা নামে এক জাতের উদ্ভিদ ব্রাজিলে হিরের ভাণ্ডারের সন্ধান দিয়েছে।

–বিরাট দেশ, যার অনেকটাই অজানা কিংবা মাহাসাগরে অজানা দ্বীপ যেমন এই বাস্তেন আইল্যান্ড, এইসব জায়গায় কিছু উদ্ভিদের রূপ ও লক্ষণ বিচার করে হঠাৎ কোনো খনিজ

ভাণ্ডারের ক্লু পাওয়া যায়। অন্য উপায়ে প্রসপেকটিং-এর চেয়ে জিওবোটানি পদ্ধতির খরচ খুবই কম। কোন কোন উদ্ভিদের কী কী লক্ষণ সেখানে কোন কোন ধাতুর সম্ভাবনা প্রকাশ করছে তা জানা থাকলে সায়ান্টিস্টের মনে চট করে সন্দেহ জাগাবে। পরে অবশ্য যথারীতি মেনে খোঁজ ও খোঁড়াখুঁড়ি চালাতে হবে ডিপোজিট নানে আকরের পরিমাণ বুঝতে জানতে। তবে বৈজ্ঞানিকের মনে এনে সম্ভাবনা বা সন্দেহের উদয় হওয়াটাই একটা মস্ত লাভ।

–শুধু খনিজ ধাতু আবিষ্কার নয় জলহীন, প্রায় উদ্ভিদবিহীন রুক্ষ প্রান্তরে অ্যাকাসিয়া গ্ল্যালিফেরা নামে বাবলা জাতীয় গাছ হঠাৎ হঠাৎ কোথাও থাকলে ওই বিশেষ গাছ দেখে বোঝা যায় যে ওই গাছের কাছে মাটির তলায় জল আছে। সেখানে কুয়ো খুঁড়ে বা টিউবয়েল বসিয়ে জল পেতে পারো।

আফ্রিকা মহাদেশের আদিবাসীরা প্রাচীনকাল থেকে জলহীন শুষ্ক প্রান্তরে কোথাও এই বাবলা গাছ অ্যাকাসিয়া, গ্ল্যান্ডুলিফেরা জন্মেছে দেখলে বোঝে যে সেখানে মাটির নিচে জলের ভাণ্ডার আছে। সুনন্দ বলে ওঠে, কিন্তু আপনি মিকির মুখের পোস্ত গাছের বর্ণনা শুনে এখানে ছুটে এলেন কেন, তা তো বললেন না?

–বলছি এবার। আগে ভূমিকাটা করে নিলাম। প্যাপাভেরাসিয়া সংক্ষেপে প্যাপাভের ফ্যামিলির কিছু উদ্ভিদ জমি থেকে তাদের খাদ্যের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণ তামা শোষণ করলে তাদের বৃদ্ধি বেশি হয়। প্যাপাভের হচ্ছে পপি জাতীয় গাছ। পোস্ত আর

ক্যালিফোর্নিয়ান পপি প্যাপাভের গোত্রের উদ্ভিদ। মিকির মুখে যেই শুনলাম যে বাস্তেন দ্বীপে পোস্ত গাছের ঝাড় মস্ত বড়, ক্যালিফোর্নিয়ান পপি গাছগুলো আমার বাগানের চেয়ে অনেক বড় আর পুষ্ট, তখুনি সন্দেহ হয় যে ওই দ্বীপের মাটিতে বেশি পরিমাণ তামা থাকতে পারে। আমার বাগানের পপি গাছগুলোয় অন্য সার এবং অন্য খনিজ ধাতু দিয়েছিলাম কিন্তু তামা দিয়ে কখনো এক্সপেরিমেন্ট করিনি। তবে এটা যে ঘটে তা জানতাম। আর একটা কিন্তু ছিল। বাস্তেন দ্বীপের মাটিতে বা জলে কি ফসফেট বেশি? ফসফেট বেশি পরিমাণে গ্রহণ করলেও পপি গাছের বাড় বেশি হতে পারে। তাই নিজের চোখে ব্যাপারটা যাচাই করতে এতদুর এসেছি এবং এখনকার মাটিতে আর পাথরে খনিজ তামা যে প্রচুর পরিমাণে আছে তার প্রমাণও পেয়েছি।

–প্রমাণ কীভাবে পেলে? চোখে দেখে বুঝলে? সুনন্দর কণ্ঠে দ্বিধা।

–দূর বোকা, মামাবাবু হাসেন, চোখে দেখে কি তা বোঝা যায়? রীতিমতো কেমিকাল টেস্ট করে বলছি। রাসায়নিক পরীক্ষা। কালরিমেট্রিক টেস্ট।

–সেটা কী? আমি প্রশ্ন করি।

–খুব সোজা ব্যাপার। সামান্য জিনিসপত্র লাগে। আমার ওই বাক্সটাতেই সব আছে।

–কী রকম ভাবে করেন টেস্ট?

–অলরাইট। দু-চার কথায় বুঝিয়ে দিচ্ছি। ধরো, কোনো জমিতে বিশেষ কোনো খনিজ ধাতু আছে কি না জানতে প্রথমে সেখানকার অল্প একটু মাটি নাও অথবা সেখান থেকে ছোট পাথরের টুকরো নিয়ে মিহি গুঁড়ো করো। এরপর ওই মাটি বা গুঁড়ো পাথর টেস্ট-টিউবে বিশেষ রাসায়নিক দ্রব্য মেশানো তরলে ফেলো। এবার টেস্ট-টিউবটা ঝকাও। টেস্ট-টিউবের তরলের কী রং হয় লক্ষ করো। ওই রং দেখেই বুঝতে পারবে যে ওখানকার মাটিতে বা পাথরে যে ধাতু আছে ভাবছ তা সত্যি সত্যি আছে কি না? যদি থাকে, তরলের রং-এর ঘনত্ব বুঝিয়ে দেবে ওই ধাতু কী পরিমাণে আছে। বেশি না কম?

–ব্লো-পাইপ টেস্ট করেও অবশ্য এটা বোঝা যায়।

–সেটা কী?

–অতি সোজা পদ্ধতি। টেস্ট-টিউবে স্যাম্পল নিয়ে তাতে বিশেষ কেমিকাল মিশিয়ে বার্নারের ওপরে ধরে ব্লো-পাইপ দিয়ে ফুঁ দিলে ওই মিশ্র স্যাম্পলের যে রং হয় তাই দেখে। রং দেখে বুঝতে পারা যায় স্যাম্পেলে প্রধানত কী ধাতু আছে এবং কেমন পরিমাণে। যাগে আর সময় নষ্ট করব না আপাতত। তোমাদের আগ্রহ থাকলে দেশে ফিরে হাতে-কলমে পরীক্ষা করে দেখো।

সুনন্দ খুশি হয়ে বলে, যাক কপার তাহলে পেয়েছ। আমাদের এখানে আসা সার্থক হয়েছে।

–পেয়েছি বইকি। মামাবাবু সায় দেন দীপ্ত কণ্ঠে, শুধু কি তামা আরও দামি ধাতুও–বলতে বলতে তিনি যেন কথা গিলে ফেলেন। বুঝলাম যে কিছু চেপে গেলেন।

সুনন্দ বলে, ইন্দোনেশিয়ায় কি আর কোথাও তামা পাওয়া গেছে?

–গেছে বইকি। বোর্নিও সেলেবিস টাইমর-এর কয়েক জায়গায় কম বেশি তামার আকর আবিষ্কৃত হয়েছে। তাই এখানে পাওয়াটা মেটেই দৈবাৎ ব্যাপার নয়। জানো, বহু কোটি বছর আগে ভারতবর্ষ থেকে অস্ট্রেলিয়া অবধি ডাঙার যোগাযোগ ছিল। টানা ভখৎ। পরে ভূমিকম্প ইত্যাদি ভূ-প্রকৃতির আলোড়নে কিছু জায়গা জলের নিচে তলিয়ে যায়। সৃষ্টি হয় এখনকার দ্বীপময় ইন্দোনেশিয়া। ফের ভূকম্পে কিছু ডাঙা জলের ওপর মাথা তোলে। প্রচুর ছোট ছোট দ্বীপ সৃষ্টি হয়। তাই এখানে কাছাকাছি অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি এবং শিলাস্তরের গঠনে খুব মিল আছে। হয়তো কখনো জাভা, সুমাত্রা, নিউগিনিতেও তামা আবিষ্কার হবে। নাঃ অনেক বকেছি, আর নয়।

মামাবাবু ঢক ঢক করে এক গ্লাস জল খেয়ে একেবারে মৌনব্রত অবলম্বন করলেন।

আমি ও সুনন্দ তাঁর তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসি অগত্যা।

.

০৭.

আমাদের ভাগ্য ভালো। হামিদ মাঝি নৌকো সমেত ফিরতে দেরি করেনি।

এবার ফেরার পালা। আমরা গোছগাছ শুরু করি। হামিদ আর তার দুই মাঝি অবশ্যই সেই রাতে বাস্তেন দ্বীপে কাটাল না। রাত কাটাতে চলে গেল তাদের পুরোনো আস্তানায় শিলালিপি দ্বীপে।

সে রাতে বৃষ্টি হল খুব। অঝোর ধারায় ঘণ্টা তিনেক।

পরদিন সকালে অবশ্য আকাশ দিব্যি মেঘমুক্ত। হামিদরা বাস্তেন দ্বীপে ফিরে এল সকাল সকাল। খানিক বাদেই আমরা রওনা হলাম নৌকোয়। জাকার্তায় কয়েক দিন কাটিয়ে ফিরে যাব দেশে।

আমাদের ফেরার আগে থেকেই মিকি সুনন্দকে পাকড়েছিল–কয়েকটা মাছের রান্না আর সেই মাংসের পোলাও আপনি যেমন বেঁধেছিলেন ফর্মুলাটা আমায় ভালো করে শিখিয়ে দিন। বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে শেখাব রান্নাগুলো। ওঃ দারুণ খেতে।

মুশকিল। সুনন্দর রান্না খেয়ে মিকির স্বাদবোধ পালটে গেছে। ঘরের রান্না আর বুঝি পছন্দ হচ্ছে না।

সুনন্দর অবশ্য আপত্তি নেই শেখাতে। তার মশলার স্টক এখনো কিছু বাকি। নৌকোয় যেতে যেতে সে মিকিকে হাতে কলমে রান্না শেখায়।

.

জাকার্তা হোটেলে বসে কথা বলছি আমি, সুনন্দ, মামাবাবু। মামাবাবু হঠাৎ বললেন, সেদিন ভাঙিনি ব্যাপারটা, আজ বলছি। জানো, বাস্তেন আইল্যান্ডে আমি সোনার খোঁজ পেয়েছি।

–অ্যাঁ সোনা! আমি ও সুনন্দ চমকাই। কোথায়?

–ঠিক কোথায় আছে ডিপোজিট বলতে পারব না, তবে নির্ঘাৎ আছে কোথাও ঝরনার কাছাকাছি মাটির তলায়। ঝরনার দুধারে মাটিতে বালিতে আর ঝরনাটা যেখানে সমুদ্রতটে পড়েছে সেখানের বালিতে সোনা পেয়েছি।

--সোনা চিনলেন কীভাবে? সুনন্দর প্রশ্নে যেন অবিশ্বাস।

--বালি মাটি প্যানিং করে। ঝরনার ধারে ধারে ছড়ানো নুড়ি পাথরের গুঁড়ো প্যানিং করে। সোনা খুঁজতে প্যানিং পদ্ধতিটা জানো?

–না। ঠিক জানি না। তবে নাম শুনেছি। আমরা উভয়ে আমতা আমতা করি।

–সোজা ব্যাপার। একটা বড় কানা উঁচু সপ্যানের মতো গোল পাত্র চাই। যার নিচটা সমান আর ওপরের ফাঁক প্যানের তলার চেয়ে বড়। ময়লা মেশানো বালিমাটি বা পাথরের গুড়ো প্যানে ফেলে অনেকখানি জল মেশাও। আস্তে আস্তে ঝাঁকাও, নাড়ো, ঘরিয়ে ঘুরিয়ে। স্যাম্পল-এ মেশা ভারীধাতু যেমন, সোনা লোহা নিচে প্যানের তলায় থিতিয়ে জড়ো হবে। বাজে ময়লা জলে গুলে যাবে বা ভাসবে। আস্তে আস্তে ওপরের ঘোলা ময়লা জল ফেলে দাও। নিচে জমা সোনা থাকলে তার হলুদ রং দিব্যি চোখে পড়বে। সেই অতি ক্ষুদ্র কণার মতো সোনার গুঁড়ো বা টুকরো আরও ছেঁকে ছেঁকে বের করতে হয়। ডিটেলস-এ যাচ্ছি না এখন। জেনো, এই কায়দাতেই সুবর্ণরেখা নদীর দুধারের বালি ছেঁকে স্থানীয় লোক সোনার গুঁড়ো বা টুকরো জোগাড় করে।

–এরপরেও আছে অ্যামালগামেশন পদ্ধতি। প্যানের তলায় থিতিয়ে-পড়া সোনার রেণু অন্য খাত থেকে আলাদা করতে। সোনার এমন কিছু গুণ আছে যাতে মাটি, বালি বা পাথরের গুঁড়ো থেকে সোনাকে আলাদা করা যায় সহজেই। মানে ক্যাম্পে বসে আমার এ

সরঞ্জামের সাহায্যেই। যুগে যুগে স্বর্ণসন্ধানীরা পৃথিবীর নানান জায়গায় নদী বা অজীরে এমনি সহজ উপায়েই সোনা খুঁজেছে। আজও খোঁজে।

–সোনার আকরের ওপর দিয়ে ঝরনা বা নদীর জল আসার সময় অতি ক্ষুদ্র সোনার টুকরো কণা বয়ে নিয়ে আসে আরও সব খনিজ পদার্থ ধুলো ময়লার সঙ্গে। সেই সোনা। ন বা নদীর গতিপথের দু পাশে মাটিতে বালিতে মেশে। এছাড়া জলের স্রোত বয়ে আনে সোনা মেশানো পাথরের নুড়ি।

–তুমি বুঝলে কীভাবে ঝরনার ধারে সোনা আছে? আগে জানতে? প্রশ্ন করে সুনন্দ।

-মোটই নয়। সন্দেহটা জাগে বাস্তেনের পোড়ো ভিটে দেখতে গিয়ে। সেখানে কয়েকটা ভাঙা মরচেধরা প্যান দেখি। সোনা খুঁজতে প্রসপেকটররা ঠিক এমনি প্যান ব্যবহার করে। তাতেই হয় সন্দেহ। কী কাজে লাগত প্যানগুলো? যে পাত্রগুলো আমরা সঙ্গে এনেছি তাই থেকে একটা কানা উঁচু পাত্র জোগাড় করি গোল্ড প্যানিং-এর কাজ চালাতে।

-তামা সোনা সব রয়েছে একই জায়গায়? সুনন্দ খুঁতখুঁত করে।

–থাকতেই পারে। অস্বাভাবিক কিছু নয়, বলেন মামাবাবু, ইন্দোনেশিয়ার অনেক জায়গাতেই তামা সোনা একই সঙ্গে পাওয়া গেছে।

এমনকি কোথাও কোথাও এদের সঙ্গে রুপোও মিলেছে। সব মিলেমিশে আছে। তবে সব ধাতুই বেশি পরিমাণে নাও থাকতে পারে।

–সোনা বের করে বাস্তেন করত কী? নিশ্চয় বিক্রি করত? আমি মুখ খুলি।

মামাবাবু বলেন, আমারও তাই সন্দেহ। জাকার্তায় তো যেত মাঝে মাঝেই। শিল্পকর্ম বিক্রি এবং তার সঙ্গে গোপনে সোনা বিক্রি দুটোই হয়তো তার রোজগারের উপায় ছিল। তবে মনে হয় ওর অ্যাসিস্ট্যান্ট পো সোনার ব্যাপারটা জানত না। তাহলে সে কি আর ওই দ্বীপ ছেড়ে চলে যায় বাস্তেন মারা যাবার পর?

সুনন্দ বলল, সোনার খোঁজটা মিকিকে জানাবে না? বেচারা একদিন দুঃখ করছিল, বয়স হয়েছে, ঘর-সংসার ফেলে বছরে সাত-আট মাস সমুদ্রে ঘুরতে আর ভালো লাগে না। বাস্তেন দ্বীপের সোনা পেলে ওর খানিক সুবিধা হয়।

–জানি মিকির এই সমস্যা। কিন্তু সরি ওকে এই সোনার খোঁজ দেওয়া যাবে না।

–কেন?

–কারণ তাহলে খবরটা ঠিক ফাঁস হয়ে যাবে। তখন গাদা গাদা লোক ওখানে ছুটবে সোনার লোভে। মিকির ভাগ্যে আর কতটুকু সোনা জুটবে। মাঝ থেকে বাস্তেন দ্বীপ

ছারখার হয়ে যাবে লোভী মানুষের ভিড়ে। পুরো দ্বীপটা ইজারা নিয়ে নিজের দখলে রাখা মিকির সাধ্যি নয়।

আমাদের দুঃখী মুখ দেখে মামাবাবু সান্ত্বনা দেন, মিকি আমাদের জন্যে অনেক করেছে সত্যি। ওকে আমি পুরস্কার হিসেবে মোটা টাকা দিয়ে যাব। তাই দিয়ে করুক ব্যবসা। জমি জায়গাও কিনতে পারে। তবে আমার মনে হয় ইচ্ছে থাকলেও ও বেশি দিন ঘরে টিকতে পারবে না।

–কেন? কেন? প্রশ্ন আমাদের।

–এটা জাহাজি নাবিকদের স্বভাব। জলে ঘুরে ঘুরে এমন অভ্যেস হয়ে যায় যে বেশি দিন স্থির ভাবে ডাঙায় কাটালে তাদের হাঁপ ধরে। এমন কেস আমি অনেক শুনেছি। রিটায়ার না করা পর্যন্ত অর্থাৎ ক্ষমতায় যদ্দিন কুলোয় তারা জলে জলে ঘোরে। মিকি দেখুক চেষ্টা করে–

সেই রাতেই আমাদের প্লেন ছাড়বে। ফিরব কলকাতায়। বাস্তেন দ্বীপে অভিযান সাঙ্গ হল। রোমাঞ্চকর স্মৃতি নিয়ে ফিরছি। এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা।

মিকিকে ছেড়ে যেতে আমাদের ভারি কষ্ট হচ্ছিল। মিকিরও তাই। মিকি আমাদের চমৎকার নকশাওলা বাতিকের কাজ করা লম্বা এক খণ্ড কাপড় উপহার দিল। ঘরে সাজিয়ে রাখব কলকাতায়।

মিকি বলল, ক্যালকাটা পোর্টে গেলে নিশ্চয় যাব তোমাদের বাড়ি। ব্রাদার সুনন্দর হাতের রান্না খাব। রাইসে মিত মিশিয়ে কি জানি নাম বেঁধেছিলে? হাঁ পোলাও। ওঃ দারুণ খেতে। ওইটে খাওয়াতে হবে। যাবার আগে মামাবাবু ফের সাবধান করে দিলেন মিকিকে–মনে রেখো, অন্য লোককে বলবে বাস্তেন দ্বীপ সাংঘাতিক ভূতুড়ে। খুব বেঁচে গেছ প্রাণে। ইন্ডিয়ান মন্ত্র না খাটলে ঠিক মরতে। হ্যাঁ, এখানকার আর্কিওলজি ডিপার্টমেন্টে শিলালিপিটার খবর জানিয়েছি। ওরা বলেছে, কয়েক দিনের মধ্যেই শিলালিপিটা নিয়ে আসবে। পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করবে। খ্যাপাটে চিয়াং যদি ওই দ্বীপে গুপ্তধন খুঁজে বেড়ায়–খুঁজুক। যদি চিয়াং তোমায় পাকড়াও করে বলবে যে ওই ইন্ডিয়ানগুলো ফিরে গেছে দেশে। আমায় গুপ্তধনের হদিস কিছু দেয়নি। কত ধরাধরি করলাম বলল না কিছুতেই। লোকগুলো অতি বাজে স্বার্থপর। তবে ওরাও গুপ্তধন পায়নি এযাত্রা। তাহলে আমি ঠিক টের পেতাম।

শুনে মিকি ঘাড় নেড়ে একগাল হেসে বলল–অলরাইত।